সাহাবা চরিত

মূল উর্‌দূ ঃ হযরত মাওলানা হাফিয আলহাজ্ব মোহাম্মদ যাকারিয়া (রহঃ)

অনুবাদক ঃ ডক্টর মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন
সহকারী অধ্যাপক
আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্ট্যাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

সাহাবা চরিতের বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বীনের জন্য কষ্ট ভোগ ও নির্যাতন সহ্য

তৃতীয় অধ্যায়

রাসূল (সাঃ) ও সাহাবা (রাঃ)-এর আল্লাহ্‌ভীতি

চতুর্দশ অধ্যায়

সিয়াহ-সিত্তার হাদীস সংকলন

চতুর্থ অধ্যায়

সাহাবায়ে কিরামের পরহেজগারী ও দারিদ্র

পঞ্চম অধ্যায়

সাহাবী (রাঃ)—দের পরহেযগারী ও তাকওয়া

ষষ্ঠ অধ্যায়

নামাযে অনুরাগ ও বিনয়

সপ্তম অধ্যায়

সাহাবীদের দয়া ও পরোপকার

অষ্টম অধ্যায়

বীরত্ব ও সাহসিকতা এবং মৃত্যুর প্রস্তুতি

নবম অধ্যায়

সাহাবায়ে কিরামের যুগে জ্ঞানচর্চা

দশম অধ্যায়

মহিলাদের শিক্ষাদান পদ্ধতি ও নানা ঘটনা

একাদশ অধ্যায়

সাহাবা যুগে শিশুদের ধর্মীয় ভাবধারা

দ্বাদশ অধ্যায়

নবী প্রেমের কয়েকটি অপূর্ব কাহিনী

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কয়েকজন নিষ্ঠাবান সাহাবা পরিচিতি

প্রকাশকের কথা

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র সুমহান আল্লাহর জন্য। অগণিত দরূদ ও সালাম প্রিয় রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি ও তার আহলে বাইত এবং তাঁর প্রশংসিত সাহাবায়ে কিরামের প্রতি।

মূল উর্দু পুস্তক হেকায়েতে সাহাবা (রাঃ)-এর ভাবানুবাদ "সাহাবা চরিত" নামে আত্মপ্রকাশ করছে। ইসলাম মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম যার যাবতীয় সব কিছুই সত্য ও ইতিহাস নির্ভর। কল্পনার প্রসূত কোন কাহিনী বা অতিরঞ্জিত কোন বিষয় ইসলামে নেই। কোরআন হাদীসে যে সমস্ত বানী বিবৃত হয়েছে তার বাস্তবতা নিখুঁত ভাবে ইসলামের ইতিহাসের পাতায় সুসংহতভাবে যুগে যুগে রক্ষিত হয়েছে।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে রাসূল (সাঃ)-এর বাস্তব জীবনে সংঘটিত বিষয়গুলোই উপস্থাপন করছি। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা আজ অপসংস্কৃতির সয়লাবে পরিপূর্ণ। চরিত্র গঠনমূলক কাজে উৎসাহ প্রদান করার মত মানুষ পাওয়া সত্যিই দুষ্কর। মানুষের মন পরিবর্তনশীল, আর এই পরিবর্তন আনয়ন করতে হলে কোরআন-হাদীসের আলোকে আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। এই গ্রন্থে রাসূল (সাঃ)-এর প্রদর্শিত পথে সাহাবায়ে কিরামের কাহিনীগুলোই তুলে ধরা হয়েছে। কোন পাঠক তা থেকে নির্দেশনা পেয়ে সুন্দর জীবন গঠনে পরিচালিত হলে আমাদের অর্থাৎ এই গ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের নাযাতের উসীলা হবে। আমাদের প্রচেষ্টা স্বত্ত্বেও ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। যদি কোন পাঠকের এরকম ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় তা জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে-ইনশাল্লাহ্।

বিনীত
প্রকাশক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

সাহাবা চরিতের বৈশিষ্ট্য

সুহবত আরবী শব্দের বহুবচনে সাহাবী শব্দের উৎপত্তি। বাংলা ভাষায় এর আভিধানিক অর্থ হল সাথী, সংগী, সহচর অর্থাৎ আত্মনিবেদিত প্রাণ। যে সমস্ত আত্মনিবেদিত সহচর ব্যক্তিগণ ঈমানের সাথে এক মুহূর্ত আল্লাহ্‌র নবী-রাসূল (সাঃ)-এর সঙ্গ লাভে জীবন অতিবাহিত করে ঈমানী হৃদয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন, তাঁদেরকে ইসলামী পরিভাষায় সাহাবা নামে আখ্যায়িত করা হয়। সাহাবাদের পরিচয় দিতে গিয়ে অনেকেই বিভিন্ন ধরনের অভিমত ব্যক্তি করে সাহাবা বলে চিহ্নিত করার জন্য অনেক শর্তারোপ করেছেন। তবে সার্বিক বিশ্লেষণে যে সংজ্ঞাটি অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ, যুক্তিসম্মত এবং সর্বজন স্বীকৃত তা হল আল্লামা ইব্‌নে হাজার (রহঃ)-এর সংজ্ঞা। তিনি বলেন, "যিনি রাসূল (সাঃ)-এর উপর ঈমান সহকারে তাঁর সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং ইসলামের উপর মৃত্যু বরণ করেছেন তিনিই সাহাবী বলে পরিগণিত হবেন। এ সংজ্ঞাটি পর্যালোচনা করলে যা দাঁড়ায় তা হল, প্রথমতঃ যাঁরা রাসূল (সাঃ)-এর দর্শন লাভ করেছে কিন্তু তাঁর উপর ঈমান আনেনি, এমন লোক সাহাবী হিসাবে গণ্য হবে না। যেমন আবু জাহল, আবু লাহাব প্রমুখ সে সময়ের কাফেরবৃন্দ। দ্বিতীয়তঃ যাঁরা ঈমান অবস্থায় রাসূল (সাঃ)-এর সাক্ষাত লাভ করেছেন কিন্তু অন্ধত্ব বা এ ধরনের কোন কারণে তাঁকে চোখে দেখতে পারেননি, তাঁরাও সাহাবী হিসাবে গণ্য হবেন। যেমন অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উম্মে মাখতুম (রাঃ)। তৃতীয়তঃ যাঁরা ঈমানী সহকারে রাসূল (সাঃ)-এর সাক্ষাত লাভ করেছেন, কিন্তু পরে মুরতাদ হয়েছে, পুণরায় মুসলমান হয়ে ইসলামে মৃত্যু বরণ করেছেন, এ দ্বিতীয় বার ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল (সাঃ)-এর সাক্ষাত লাভ না করলেও তাঁরাও সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হবেন। যেমন হযরত আশয়াস ইব্‌নে কায়েস (রাঃ)। এ আলোচনায় সার সংক্ষেপ হিসাবে বলা চলে, যাঁরা ঈমান সহকারে অল্প বা বেশী সময় রাসূল (সাঃ)-এর সাক্ষাত করেছেন। তাঁরা রাসূল (সাঃ) থেকে কোন যুদ্ধে শরীক থাকেন বা নাই থাকেন, এমনকি যাঁরা সামান্য সময়ের জন্য রাসূল (সাঃ) -এর সাক্ষাত লাভ করে ঈমানী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁরা সবাই সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। এটাই হল ইসলামী চিন্তাবিদদের সর্বসম্মত অভিমত।

সাহাবীদের সংখ্যা ঃ রাসূল (সাঃ)-এর কতজন সাহাবী ছিলেন তা সুনির্দ্দিষ্ট করে বলা দূরহ ব্যাপার। কেননা রাসূল (সাঃ)-এর রেসালাতি যুগে অগণিত লোক ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর সান্নিধ্যে আসেন তাঁরা সকলেই সাহাবী। ইমাম আবু মা'রআ (রাঃ)-এর এক বর্ণনায় দেখা যায়, রাসূল (সাঃ) থেকে শুধু হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের সংখ্যাই এক লাক্ষের উপরে। তাহলে যে সকল সাহাবী কোন হাদীস বর্ণনা করেনি তাঁদের সংখ্যা যে কত বিপুল তা সহজেই অনুমেয়। কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, দশম হিজরীতে অনুষ্ঠিত বিদায় হজ্বে দশ লাক্ষেরও বেশী সাহাবীদের সমাগম হয়েছিল। অতএব নির্দ্দিষ্টভাবে সাহাবীদের সঠিক সংখ্যা নির্ধারন করা অসম্ভব ।

সাহাবীদের মর্যাদা ও গুরুত্ব ঃ তাঁদের মর্যাদা অসাধারণ পর্যায়ের ছিল। রাসূল (সাঃ) -এর সাহচার্য লাভে সাহাবীগণ যে নূর লাভ করেছিলেন সে নূর বা আলো সাহাবীদের আসাধারণ মর্যাদার উৎস। তাঁদের সমাজ ছিল একটি আদর্শ মানব সমাজ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের সততা, বিশ্বস্ততা,ভদ্রতা, আত্মত্যাগ, সদাচারণ, আল্লাহভীতি, তাকওয়া, ইহসান, সহানূভূতি, বীরত্ব , সাহসীকতা সবই ছিল নজীর বিহীন। তাঁরা ছিলেন নিষ্কলুষ ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারী। এক কথায় বলা চলে রাসূল (সাঃ) যে সর্বোত্তম সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, সাহাবায়ে কিরাম হচ্ছেন সে সমাজের মর্যাদার অধিকারী। সাহবাগণ হলেন সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মানব এবং হযরত রাসূল (সাঃ) -এর আদর্শের মূর্ত প্রতীক। রাসূল(সাঃ)-এর সান্নিধ্যে, তাঁর সংস্পর্ষে সাহাবীগণ পরিণত হন আর্দশমানবে। কথায় কাজে, বক্তৃতায়, ভাষণে, চলনে ফেরনে, উঠা-বসায়, আচার-আচরণে, ব্যবহারে এক কথায় যাবতীয় কর্মে রাসূল (সাঃ) -এর আদর্শ তাঁদের মাঝে প্রতিফলিত হয়। তাঁরা ছিলেন রাসূল (সাঃ) -এর বাস্তব অনুকরণ ও অনুসরনীয় ব্যক্তি। এ কারণেই তাঁদের চরিত্রে এমন সামান্যতম কলংক ঢুকেনি যার কারণে তাঁদের সমালোচনা করা যেতে পারে । অতএব রাসূল (সাঃ)-এর কোন সাহাবীর সমলোচনা করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। মহান আল্লাহ্ যাঁদের প্রতি সর্বোতভাবে নিজে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন, তাঁদের সমালোচনা করার অবকাশ থাকতে পারেনা। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সত্য এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সকল প্রকার সমালোচনার উর্ধ্বে।

সাহাবাদের মর্যাদার সমকক্ষ পরবর্তী যুগের কোন মুসলমানই তাঁদের সমমর্যাদা লাভ করতে পারেন নাই, কুরআন-সুন্নাহ এবং বিশ্ব মুসলিমের এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নাই। সাহাবীগণ ছাত্র হিসাবে রাসূলের কাছে আল্লাহ্র

কালাম অধ্যয়ন করেন। আল্লাহ্ এবং রাসূল কর্তৃক পরবর্তী উম্মতের জন্য মনোনীত এবং ঘোষিত হয়েছেন আদর্শ শিক্ষক এবং সত্যের মানদণ্ড রূপে। তাঁরাই প্রথম সূত্র রাসূল (সাঃ) -এর উম্মতের । পরবর্তী উম্মত আল্লাহ্র কুরআনের ব্যাখ্যা ভাষ্য, রাসূলের পূণ্য পরিচয়, শিক্ষা, পবিত্র জীবনাদর্শ, তাঁদেরই মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি। উম্মতের মধ্যেকার এ সূত্র উপেক্ষা করলে, স্বকীয়তা বিনষ্ট হলে স্বয়ং রাসূল (সাঃ)-এর পূণ্য পরিচয়, এমন কি কুরআন পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাই রাসূল (সাঃ) পূর্বাহ্নেই সাহাবাদের মান-মর্যাদার অসাধারণ গুরুত্ব ও প্রয়োজন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন। তাঁদের ঈমানের মত না হলে হিদায়াত নাই, মূল্য নাই; একমাত্র তাঁদের ঈমানের মত ঈমানই নির্ভরযোগ্য, হিদায়াতের মানদণ্ড; তাঁদের আদর্শের অনুসরণেই পরবর্তীরা আল্লাহ্র প্রসন্নতা লাভ করতে পারে। সাহাবাদের মর্যাদা সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা–

(১) আল্লাহ্ তাঁদের অন্তরের তাক্ওয়ার পরীক্ষা নিয়েছেন। –(সূরা হুজুরাত)

(২) আল্লাহ্ তাক্ওয়ার সত্যকে তাঁদের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে দিয়েছেন। –(সূরা ফাতাহ)

(৩) সাহাবাদের সম্বোধন করে আল্লাহ্ বলেছেনঃ "আল্লাহ্ ঈমানকে তোমাদের প্রিয় এবং তোমাদের মনে ঈমানকে শোভা-সুন্দর করে দিয়েছেন; কুফুর, পাপ এবং আল্লাহ্র নাফরমানী তোমাদের কাছে অপ্রিয় করে রেখেছেন। –(সূরা হুজুরাত)

(৪) " হে আল্লাহ্ আমাদেরকে সে সিরাতে মুস্তাকীমে পরিচালিত কর; তোমার অনুগ্রহ প্রার্থীরা যে পথে চলেছেন।" সূরা ফাতিহাতে বিশ্ব মুসলিমকে যাঁদের পথে চলার জন্য আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করার এ নির্দেশ দিয়েছেন, বলা বাহুল্য সাহাবাগণই সে শ্রেষ্ঠতম বা অনুগ্রহ ভাজনদের অন্যতম।

(৫) "লোকেরা যেভাবে ঈমান এনেছে, তোমরা সে ভাবে তাঁদের মতই ঈমান আন; যখন তাঁদের বলা হয়, তখন তাঁরা বলে আমরা ঈমান এনেছি"–সূরা বাকারার আয়াতটিতে মুনাফিক এবং অন্যান্য অমুসলিমদিগকে বলা হয়েছে যে, তোমরা সাহাবাদের ঈমানের মত খাঁটি ঈমান আনয়ন কর; আয়াতটি সাহাবাদের উদ্দেশ্যেই ইংগিত করা হয়েছে।

(৬) "মুনাফিকরা যদি তোমাদের ঈমানের মত ঈমান আনয়ন করে তাহলে তাঁরা হিদায়াত লাভ করবে।"

লক্ষ্য করুন সাহাবাদের ঈমানকে কি ভাবে অন্যান্যদের ঈমানের, হিদায়াতের মানদণ্ড রূপে ঘোষণা করা হয়েছে।" প্রথম পর্যায়ের মুহাজির, আনসার এবং তাঁদের আদর্শে উত্তম রূপে অনুসারীদের প্রতি আল্লাহ্ প্রসন্ন রয়েছেন এবং তাঁরাও আল্লাহ্র প্রতি প্রসন্ন। সাহাবাদের আদর্শ কিভাবে আল্লাহ্র প্রসন্নতার মানদণ্ড রূপে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন, তাঁরাও আল্লাহ্র প্রতি প্রসন্ন রয়েছেন, তাঁদের জন্য জান্নাতের সু-সংবাদ দেয়া হয়েছে, চিরস্থায়ী জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দান করা হয়েছে।

"তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠতম উম্মতরূপে তৈরী করা হয়েছে। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে তোমরাই সাক্ষী নিযুক্ত হবে।" বলাবাহুল্য সাহাবারাই আয়াতে বর্ণিত "শ্রেষ্ঠতম উম্মতের" শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন এতে কোন সন্দেহ নাই।

(৭) জনসাধারণের জন্য শ্রেষ্ঠতম উম্মত হিসাবেই তোমাদের সৃষ্টি বা আত্ম প্রকাশ" এখানেও বর্ণিত "শ্রেষ্ঠতম উম্মত" এর শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন সাহাবাবৃন্দই।

(৮) "তাঁরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত" সঠিক পথে; আয়াতটিকে সাহাবাদের সম্পর্কেই ঘোষণা করা হয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁদেরকে হিদায়াতের সনদ দান করেছেন।

(৯) "তাঁরাই সত্যনিষ্ঠ" (সূরা হাশর) প্রথম দিকে মুহাযির সাহাবাদের গুণাবলী বর্ণনার পর তাঁদেরকে "সাদিক" বা সত্যনিষ্ঠ বলে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন।

(১০) "তারাই সফল মনোরথ" (সূরা হাশর) বাক্যটির প্রথমাংশে আন্সার ও সাহাবাদের প্রশংসা করে আয়াতটিতে আল্লাহ্ সফল মনোরথ বলে তাঁদেরকেই চিহ্নিত করেছেন।

সাহাবা (রাঃ)-গণ সমালোচনার উর্ধ্বেঃ পবিত্র কুরআনে সাহাবাদের সম্পর্কে উপরোল্লেখিত ঘোষণা এবং প্রশংসার পর কোন মুসলমানই তাঁদের সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা বা সমালোচনা করতে পারে না। স্বয়ং আল্লাহ্ যাঁদের প্রশংসা করে সততা, হিদায়াত ও ন্যায়নিষ্ঠ প্রভৃতির উপাধী এবং সাক্ষ্য শাহাদত ঘোষণা করেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে বিপরীত ধারণা, সমালোচনা এবং ভাল-মন্দ বিচার করতে যাওয়া সুস্পষ্টতঃ আল্লাহ্র ঘোষণায় অনাস্থা ব্যতিত আর কিছুই নয় এবং বলা বাহুল্য যে, কোন মুসলমানই এ ধরণের অভিশপ্ত ধারণা এবং দুঃসাহস করতে পারে না।

রাসূল (সাঃ)-এর দৃষ্টিতে সাহাবায়ে কিরামগণঃ পবিত্র কুরআনে

সাহাবাদের উচ্চ প্রসংশা করে তাঁদেরকে হিদায়েতের মানদন্ড বলে ঘোষণা করে, তাঁদের ঈমান ও আদর্শকে পরবর্তীদের ঈমান আমলের শুদ্ধাশুদ্ধির কষ্টিপাথর রূপে নির্ণীত করেছে, এটাই শেষ নয়, বরং রাসূল (সাঃ) ও অনুরূপ সুস্পষ্টভাবে সাহাবাদের উচ্চ প্রশংসা করে তাঁদের আদর্শ অবশ্যই উম্মতকে অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাঁদের সমালোচনা ও স্বকীয়তা বিনষ্ট করার অভিশপ্ত প্রচেষ্টা হতে রাসূল (সাঃ)-এর অনুসারীগণকে বিরত থাকতে সুস্পষ্ট ভাষায় কঠোর ভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

হযরত উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত-একদিন রাসূল (সাঃ) সাহাবাদের অন্তর্বিরোধ সর্ম্পকে আল্লাহ্র কাছে জিজ্ঞেস করলে ওহী আসে "মুহাম্মদ! তোমার সাহাবাগণ আমার কাছে আসমানের প্রতীক; যে কেহ তাঁদের কোন আদর্শ অনুসরণ করবে, সে-সুনিশ্চিত হিদায়াত লাভ করবে।" রাসূল (সাঃ) ঘোষণা করে বলেন-আমার সাহাবাগণ নক্ষত্র সদৃশ; তাঁদের যে কোন জনের অনুসরণে তোমরা হিদায়াত লাভ করবে। রাসূল (সাঃ) বলেন- আমার উম্মতের মধ্যে একটি আদর্শের অনুসরণেই নিশ্চিত জান্নাত এবং মুক্তি লাভ করবে। সাহাবাদের এ জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলেন-যাঁরা আমার উম্মত এবং আমার সাহাবাদের আদর্শে সুপ্রষ্ঠিত পথে অবিচলিত রয়েছে। (মিশকাত) তিনি আরও বলেন-আমার অর্বতমানে তোমরা আবু বকর ও উমর (রাঃ)-এর অনুসরণ করবে।

রাসূল (সাঃ) সাহাবাদের সমালোচনা নিষিদ্ধ করে বলেন, আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে বলছি, তোমরা আমার সাহাবাদের সমলোচনা করবে না। মনে রেখ তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ ,ভালবাসা প্রকান্তরে আমার প্রতিই বিদ্বেষ, ভালবাসা বই কিছু নয় ।- (তিরমিযী ; শিফা)।

আমার সাহাবাদিগকে তোমরা গালি দেবে না । মনে রাখবে আল্লাহ্র পথে তাঁদের যে কেহ মুষ্টিমেয় যব দান করেছেন, তোমরা ভুবন ভরা স্বর্ণ, রৌপ্য দান করেও তাঁদের সে এক মুষ্টি যবের মর্যাদা লাভ করে পারবে না। –(তিরমিযী)

এক হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেন- আমার সাহাবাদিগকে কেহ গালমন্দ দিচ্ছে যদি দেখ, তাহলে বল, তোমাদের এ জঘণ্য কাজে আল্লাহ্র লানত হোক। (তিরমিযী)

প্রসিদ্ধ সীরাত গ্রন্থ "শিফা" তে বর্ণিত রয়েছে রাসূল (সাঃ) বলেন, আমার সাহাবাদের আলোচনা কালে সংযত থাক। আমার সাহাবাদিগকে যে কেহ মন্দ বলবে তার উপর আল্লাহ্ ফেরেশতা এবং বিশ্বমানবের লানত পড়বে, তার কোন

সৎকর্মই আল্লাহ্র দরবারে কবুল হবে না। সমগ্র বিশ্বমানবের মধ্যে আমার, সাহাবারা আল্লাহ্র কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং হযরত আবু বকর, উমর, উসমান, আলী (রাঃ) তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমার সাহাবা মাত্রই পূণ্যের প্রতীক। তিনি (সাঃ) আরও বলেন–যে আমার সাহাবাদের ব্যাপারে হিফাযত করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার হিফাযত করব। বলাবাহুল্য সাহাবাদের মান-মর্যাদার হিফাযতই প্রকৃতপক্ষে রাসূল (সাঃ)-এর হিফাযত এবং এ জন্যই এর এত গুরুত্ব। তিনি (সাঃ) আরও বলেন, যে আমার সাহাবাদের ব্যাপারে যে আমার কথা রাখবে, সে কিয়ামতের দিন হাউযে কাওসারে আমার কাছে আসবে, পক্ষান্তরে যে তা রাখবে না, সে হাউযে কাওসারে আমার কাছে উপস্থিত হতে পারবে না। – (শিফা)

আল্লাহ্ রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশে ইসলামী চিন্তাবিদগণ প্রথম যুগ হতে এখন পর্যন্ত সকলেই একবাক্যে সিদ্ধান্ত নিয়াছেন, সাহাবারা সমালোচনার উর্ধ্বে, তাঁদের দোষ-ত্রুটির বিচার, স্বকীয়তা বিনষ্ট এমন উক্তি বা আচরণ নিঃসন্দেহে ইসলাম দ্রোহীতা। এতে ঈমান, আখিরাত উভয়েই বিনষ্ট হয়। যারা একাজে প্রবৃত্ত হয় তাদের মুসলমান বলা যায় না।

সহীহ্ বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে, হিজরী দ্বিতীয় শতকের বিখ্যাত মুহাদ্দীস মুআফা ইব্নে ইমরান (রাঃ) বলেন- পরবর্তী যুগের যত বড় মণীষীই হন না কেন, সাহাবাদের সাথে কারও তুলনা হয় না। এমন কি হযরত উমর ইব্নে আবদুল আযীয (রহঃ) তাঁর অতুলনীয় মহত্ব সত্ত্বেও আমীর মুআবিয়া (রাঃ)-এর সম মর্যাদা সম্পন্ন হওয়া ত দূরের কথা, তাঁর ধারে কাছেও যেতে পারেন না।"

হযরত সহল ইব্নে আবদুল্লাহ্ তসতরী (রাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি সাহাবাদের সম্মান করে না এবং তাঁদের নির্দেশাবলীর গুরুত্ব দেয় না, সে কখনও প্রকৃত মুমিন মুসলমান হতে পারে না।"

মুহাদ্দীস হযরত আইয়ুব সখ্তীয়ানী বলেন– যে ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে ভালবেসেছেন, সে তাঁর দ্বীনকে মযবুত করে নিয়েছেন; যে ব্যক্তি হযরত উমর (রাঃ)-কে ভালবেসেছেন, সে নিজের মুক্তিপথ পরিস্কার করেছেন। যে ব্যক্তি হযরত উসমান (রাঃ)-কে ভালবেসেছেন, সে আল্লাহ্র নূরের আলো লাভ করেছেন; আর যে ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)কে ভালবেসেছেন, সে সুদৃঢ় রজ্জু আকড়িয়ে ধরেছেন। আর যে কেহ রাসূল (সাঃ)-কে প্রশংসা ও সম্মান করেছেন, সে নিফাক থেকে মুক্তি লাভ করেছেন। আর যে ব্যক্তি কোন একজন

সাহাবাদের অবমাননা করেছে, সে দ্বীনভ্রষ্ট, সুন্নাত-বিরোধী; বলে পরিগণিত হয়েছে, সুতরাং তার কোন আমলেই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না বলে আমার আশংকা।–(শিফা)

মুহাদ্দীস হাফিয ইব্নে হযর (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "ইসাবা"র প্রথম খন্ডে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হাফিয আবু যরআ রাযী (রহঃ)-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেনঃ যখন দেখবে যে, কোন একজন সাহাবার অবমাননা করছে, তখন তাকে জানবে নির্ঘাত অমুসলমান বলে। এদের আসল উদ্দেশ্য হল দ্বীন ইসলামের সত্যতার সাক্ষী বিনষ্ট করে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা।" এরা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই এমন অপকর্ম এবং ধৃষ্টতা, দুরভিসন্ধি করে ইসলামের ভিত্তিমূলে আঘাত হানতে সচেষ্ট হয়।"

হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফত আমলে আবদুল্লাহ্ ইব্নে সাবা নামক এক বিশিষ্ট ইহুদী মুসলমানের ছদ্মবেশে সমালোচনার এ বীজটি বপনের সূত্রপাত করেছিল। ইসলাম দ্রোহীর, পরবর্তীতে যুগে যুগে সুকৌশলে এ ধারাই সূক্ষ্মভাবে ব্যবহার করে আসছে মুসলমানরা যাতে এ দূরভিসন্ধি এবং চক্রান্তের শিকারে পরিণত না হয়, এজন্যই ইসলামের সূচনাতে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) সাহাবাদের মান মর্যাদা ঘোষণা করে তাঁদেরকে বিচার সমালোচনার উর্ধ্বে ঘোষণা করেছেন। সাহাবাদের সম্পর্কে এমন ধৃষ্টতা প্রদর্শনে বিরত থাকতে মুসলিম উম্মাহকে কঠোরভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন। কারও দোষগুন, ভালমন্দ বিচার করতে হলে তার ব্যক্তিত্ব বিতর্কিত, স্বকীয়তা আহত এবং জনমনে তার প্রতি আস্থা দুর্বল হতে বাধ্য। যারা সাহাবাদের সমালোচনা করতে যায়, তারা প্রকৃতপক্ষে সাহাবাদের পরিবেশিত সত্যতাকে অনিশ্চিত, করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমরা আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের পরিচয় জেনেছি সাহাবাদের মাধ্যমেই; তাঁরাই আমাদের মধ্যসূত্র, সর্বশ্রেষ্ঠ সূত্র; উৎস যদি সন্দেহাতীত না হয় তাহলে পরিচয়ের সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা কখনও সম্ভব হতে পারে না। তাই যুগে যুগে শত্রুরা ইসলামের নামে ইসলামের মূলে আঘাত হেনে প্রচারণা সৃষ্টি করেছে এবং এ ধারা এখনো অব্যাহত রেখেছে। "আল্লাহ্র রাসূল ব্যতীত কেহই সত্যের মানদন্ড হতে পারেনা, কেহই সমালোচনার উর্ধ্বে হতে পারেনা" এ মানসিকতার আকীদা প্রচারই তাদের ইতিপূর্বে উল্লেখিত কুরআনের বর্ণনার পরও যদি বলা হয় যে, সাহাবারা রক্ত-মাংসের মানুষ; ভুল-ত্রুটি, পাপ-অপরাধ যে তাঁদের হয় নাই কিংবা হতে পারে না এমন নিশ্চয়তা কোথায়? অতএব তাঁরা সত্যের মানদন্ড এবং বিচার-সমালোচনার উর্ধ্বে হবেন কেমন করে? আর তাঁদেরকে উম্মতের অনুসরণীয় আদর্শ রূপে নির্বিচারে নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া যেতে পারে কিরূপে?

সাহাবাদের সমালোচনা বা তাঁদের বিচার করতে যাবে কে? ইতিহাস? আপনার কিংবা ইতিহাসের বিচার যে নির্ভুল, তার প্রমাণ কি? আপনার কিংবা ঐতিহাসিকের বিচার যে সন্দেহাতীত, ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে সে সত্যতা কোথায়? এক্ষেত্রে কি দিয়ে ভুলের বিচার করবেন, এ অধিকার কে দিয়েছে? এখানে স্বয়ং আপনার বিচার বুদ্ধি, ফয়সালার নির্ভুলতা অনিশ্চিত, সেখানে আপনি মহান সাহাবাদের বিচার করবেন, কোন যুক্তিতে? সমালোচনার আদালতে তাঁদের উপস্থিত করে ইতিহাসের সাক্ষী কোথায় পাওয়া যাবে? আপনার বিচার-বুদ্ধি, ইতিহাসের মন্তব্য যখন ভুলভ্রান্তি-সম্ভাবনাময়, সমালোচনা, বিচার সাপেক্ষ, তখন আপনার কিংবা ইতিহাসের পক্ষে সাহাবাদের মহান আদর্শের বিচার করার অধিকার যে আপনার নেই, নির্বিচারে, নির্দ্বিধায় মেনে অনুসরণই যুক্তিসম্মত, কল্যাণজনক, একথা অস্বীকার করতে পারবেন কি?

এক কথায় সাহাবাদের ভুল-বিচ্যুতি, ভাল-মন্দ বিচার করার অধিকার ও যোগ্যতা আপনি, আমি এবং ইতিহাস কারও নেই, একথা নেহাত যুক্তিতর্ক ও ন্যায়ের খাতিরেই স্বীকার করতেই হবে। সমালোচনায় স্বভাবতঃই সমালোচিতের স্বকীয়তায় আহত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী; জনমনে পূর্ব-পরিচিত মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে চায়; এমতাবস্থায় আপনার-আমার পক্ষে সাহাবাদের সমালোচনা, তাঁদের স্বকীয়তার উপর যে পরোক্ষ আক্রমণ এবং ইসলামের মূল ভিত্তির সত্যতা, বিশুদ্ধতাই প্রচন্ডভাবে আহত ও আক্রান্ত হতে বাধ্য। একটু চিন্তা করলেই একথা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে যায়; এমতাবস্থায় সাহাবাদের সমালোচনায় বিরত থাকাই প্রতিটি মুসলমানের যুক্তিতর্কের খাতিরেই এ কথা স্বীকার করতেই হবে। সে জন্যই এটা অযথা এবং অনধিকার চর্চা। সাহাবাদের ভুল-ত্রুটির বিচার, সমালোচনার অবকাশই নাই বলে কারও সে অধিকারও নাই; সাহাবাদের সমালোচনা ও সংশোধন আল্লাহ্ ও রাসূলের আদালতে হয়ে গিয়েছে। অন্তর্যামী আল্লাহ্ জ্ঞানে জ্ঞান-সমৃদ্ধ, আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) সাহাবাদের শিক্ষা-দীক্ষা, স্বভাব-চরিত্র, ইসলাম-প্রীতি ও মানসিকতা, তাঁদেরকে উম্মতের অনুসৃত শিক্ষকরূপে মনোনীত করেছেন। তাঁদের সার্বিক আদর্শ বিচারে মন্তব্য করেছেন যে তাঁরাই সুপথগামী, সত্যবাদী, সত্যনিষ্ট, তাঁদের প্রত্যেকেই জান্নাতবাসী; প্রত্যেককেই আল্লাহ্ তায়ালা পূণ্য পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁদের অনুসরণ উম্মতের পক্ষে অবশ্য জরুরী এবং বলাবাহুল্য যে কোন বিষয়ে আল্লাহ্ এবং রাসূলের বিচার, সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পর তাতে অন্যথা করার অধিকার কোন মুমিন মুসলমানের নাই।" এমন কি বিতর্কিত বিষয়েও আল্লাহ্র রাসূলের

বিচার প্রার্থী না হলে এবং তাঁর বিচার অম্লান বদনে মেনে না নিলে ঈমান থাকে না। এমতাবস্থায় মুসলমান বলে দাবী করলেও সে মুসলমান থাকে না। রাসূল (সাঃ) জামানায় অনুরূপ ঘটনায় জনৈক মুসলমানকে হযরত উমর (রাঃ) কতল করলে পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং ঘোষণা করে যে আল্লাহ্র রাসূলের বিচারকে অমান্য করা তো বড় কথা, তাঁর বিচার সম্পর্কে যদি অন্তরে অনুমাত্র দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে তবুও ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায় এবং এ রূপ ব্যক্তি নিজকে যতই মুসলমান বলে পরিচয় দিক না কেন, কখনও প্রকৃত মোমিন নয়। সাহাবাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ এবং রাসূলের ঘোষণা, তাঁরা সমালোচনার ঊর্ধে এবং সত্যের মানদণ্ড বলে বার বার নির্দেশের পর তাঁদের বিচার সমালোচনা করার আগে নিজের ঈমানের খবর নিতে হবে। যতক্ষণ না কারও ঈমানে ঘুন না ধরেছে, সে কখনও আল্লাহ্, রাসূলের বিচারের পর সাহাবাদের সমালোচনার মত ধৃষ্টতা করতে পারে না। সাহাবাদের ভুল-ত্রুটি হয়েছিল কিনা এবং হতে পারে কিনা, সেটা প্রশ্ন নয় বরং দেখতে হবে উম্মতের আদর্শ-অনুসৃত হিসেবে তাঁদেরকে মনোনীত করেছেন?

মানুষের মনোনয়ন নির্বাচনে নির্বাচক যতই জ্ঞানী-গুণী হোন না কেন ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে; কিন্তু আল্লাহ্ এবং রাসূলের মনোনয়নে ভুল-ত্রুটির সম্ভবনাও মুমিন মুসলমানের কল্পনাতীত। মনোনীত এবং নির্বাচিতের ভুল-ত্রুটি এবং অযোগ্যতা প্রকৃতপক্ষে যে মনোনয়নকারী এবং নির্বাচকেরই বিচারের ভুল, জ্ঞানাভাব এবং অযোগ্যতাই প্রমাণ করে একথা কে না জানে। নির্বাচিত মনোনীতের পুনর্বিচার এবং সমালোচনা যে প্রকারান্তরে বিচারক এবং মনোনয়নকারীরই সুবিচার, অবিচার এবং যোগ্যতা, অযোগ্যতার বিচার, মনোনীত এবং নির্বাচিতের সমালোচনা এবং অবমাননা, তাঁদের স্বকীয়তা বিনষ্ট হয় এমন আচরণ ও আলোচনা যে প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং বিচারক এবং মনোনয়নকারীর যোগ্যতার প্রতিই কটাক্ষ এবং তার স্বকীয়তার উপর নির্লজ্জ আক্রমণ তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। বলাবাহুল্য কুরআন এবং হাদীসের সুস্পষ্ট ঘোষণায় আল্লাহ্ এবং রাসূলই সাহাবাগণকে উম্মতের হিদায়াতের ধ্রুবতারা, অবশ্য অনুকরণীয়, আদর্শ-অনুসরনীয় যোগ্যতার বিচার পরীক্ষা করে তাঁদের সত্যের, ঈমানের মানদন্ড এবং সমালোচনার ঊর্ধে বলে রায় দিয়েছেন।

ইতিহাসের সূত্র ধরে অনেকেই সাহাবাদের সমালোচনা করে, তারা অনেকেই ইতিহাসের সঠিক মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন নয়। তাই ইতিহাস পরিবেশিত বর্ণনাকে সত্য বলে মনে করে বিভ্রান্ত হয়। অনুরূপ ভাবেই কুরআন, সুন্নাহ্র প্রকৃত মর্যাদা ও গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি না করে সব কিছুকেই

একাকার সমপর্যায়ের ভেবে ইতিহাস এবং কুরআন, সুন্নাহ্ উভয়ের প্রতিই অবিচার করে থাকে। তারা ভুলে যায়, কোন বিষয় স্থির সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে বর্ণনার নির্ভুলতা, নির্ভরতা, নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হতে হবে; বলা বাহুল্য ইতিহাস আমাদিগকে এ নিশ্চয়তা দিতে পারে না। কেননা ইতিহাস বহুরূপী, কখনও একচোখা'; ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভংগী এবং মানসিকতার প্রভাব এড়িয়ে চলার সাধ্য ইতিহাসের নাই; এজন্যই একই ঘটনার পরস্পর বিরোধী বর্ণনা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাওয়া যায়; এ চরিত্রের বিভিন্ন চিত্র অংকিত হয় ইতিহাসের তুলিকায়; একের তুলিতে যে ব্যক্তিত্ব, যে চরিত্র অনন্য মহিমাময় মহান, অন্যের তুলনায় সে চরিত্রই কুৎসিত, কদর্যহীন, শয়তানের প্রতীক; এহেন দৃশ্য নিত্য-নৈমিত্তিক সত্য। বন্ধুর তুলিতে অতি কুৎসিত চরিত্রও অনিন্দ সুন্দর, আবার শত্রুর তুলিতে অতি সুন্দরও অতি কুৎসিত হয়ে যায়; তাই সঠিক সত্য উদ্ধার করা প্রকৃতপক্ষে বড়ই কঠিন। এ জন্যই জ্ঞানীরা বলেন- ইতিহাস জানা যত সহজ, ইতিহাস বুঝা ততই কঠিন। ইতিহাস কাউকেও কখনও ডুবিয়েছে, ভাসিয়েছে, উঠিয়েছে, নামিয়েছে, তাই অনেক সাধ্য-সাধনা এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করেও কেহ প্রকৃত সত্য যে কি তা সুনিশ্চিত এবং সঠিক বলতে পারে না। ইতিহাসের এ ছলনার, গোলক ধাঁধায় আটকে গিয়ে অনেকেরই ভরাডুবি হয়েছে। শত সাধ্য-সাধনা করেও ইতিহাসের বর্ণনাকে অনেক সময় সন্দেহাতীত এবং সঠিক বলে মন্তব্য করা যায় না।

ইতিহাসের কোন গুরুত্ব নাই ঃ ইতিহাসের কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা মানব জীবনে নাই। শুধু বলা যায় ইতিহাসের পথ বড়ই পিচ্ছিল। মুহূর্তের অসাবধনতায় পদে পদে একেবারে বিভ্রান্তির গহীন খাদে পতিত হওয়ার আশংকা রয়েছে; তাই ইতিহাসের পথে পথিককে অতি সন্তর্পণে চলতে হয়। আল্লাহ্, রাসূল এবং ঐতিহাসিকের মধ্যে যে ব্যবধান কুরআন, সুন্নাহ্র এবং ইতিহাসের মধ্যেও তদ্রুপ আকাশ পাতাল ব্যবধান। আল্লাহ্, রাসূলের সাথে যেমন ঐতিহাসিকের তুলনা হয় না, কুরআন হাদীসের বর্ণনাকেও তেমনি ঐতিহাসিকের বর্ণনায় সমপর্যায় ভুক্ত করা যায় না। এমতাবস্থায় ইতিহাস যদি এ বর্ণনার বিরোধিতা করে, তাহলে সত্য এবং যুক্তির আলোকে ইতিহাসকেই কুরআন, সুন্নাহ্র অনুকূলে আত্মসমর্পণ করতে হবে, নতুবা ইতিহাস চির উপেক্ষিতই থেকে যাবে। যদি ঐতিহাসিকের বর্ণনা কুরআন, সুন্নাহ্র বিরোধী হয়, তাহলে বুঝতে হবে ইতিহাসে চাপা পড়ে রয়েছে। সঠিক তথ্য পরিবেশিত হয় নাই; প্রকৃত সত্য ঐতিহাসিকের অজ্ঞতায় যদি পূর্বোল্লিখিত কুরআন,

হাদীসের বর্ণনার বিপরীত হয়, তাহলে নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হবে ঐতিহাসিকের ভুল হয়েছে, আল্লাহ্ ও রাসূলের ভুল হতে পারে না। এমতাবস্থায় হাদীসের অনুকূলে ইতিহাসের ব্যাখ্যা করে উভয়ের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করে ঈমান বাঁচাতে হবে। ইতিহাসের বিশ্লেষণে কোন মতেই কুরআন, সুন্নাহকে বিসর্জন দেয়া চলবে না। এক কথায় বিরোধের ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ্ হবে বিচারের মানদণ্ড, ইতিহাস নয়। ইতিহাসের কিছু কিছু বর্ণনা সাহাবা চরিত্রের উচ্চ মর্যাদা, উন্নত আদর্শ সম্পর্কে, সাধারণ পাঠকের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করে থাকে। যেমন ইমাম হাসান (রাঃ)-এর মৃত্যু, কারবালার ঘটনা, হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) ইত্যাদি সম্পর্কে। বলাবাহুল্য আল্লাহ্ রাসূল বর্ণিত সাহাবাদের মর্যাদা সম্পর্কে যথোচিত সচেতনতার এবং ইতিহাস ও পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়নের অভাবই এ বিভ্রান্তির মূল কারণ।

এরূপ ক্ষেত্রে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, সাহাবাদের উচ্চ মর্যাদা আল্লাহ্-রাসূল কর্তৃক বর্ণিত বর্ণনা পক্ষান্তরে এর পরিপন্থী বর্ণনা ও ঘটনা ইতিহাস বা ঐতিহাসিকের পরিবেশনা অসত্য। কুরআন-হাদীস বলে তাঁরা ভাল; ঐতিহাসিক এবং ইতিহাস বলে না, তাঁরা নিখুঁত নয়, অন্যান্যদের মত তাঁদেরও দোষগুণ, ভালমন্দের সমাবেশ রয়েছে। এমতাবস্থায় চিন্তা করে স্থির করতে হবে কে ভুল, কে শুদ্ধ? স্বীকার করতে হবে, আল্লাহ্-রাসূল ভুল করেছেন, নয় ইতিহাস ভুল করেছে, সঠিক সত্য পরিবেশনে অক্ষম রয়েছে। শরীয়তের পরিভাষায় এরূপ আইনসম্মত বিচারকে ইজতিহাদ বলা হয় এবং বিচারককে বলা হয় মুজতাহিদ। মুজতাহিদ তিনি তো ঠিকই, যিনি ভুল করেন তিনিও ঠিক; তাঁদের যে কোন একজনের সিদ্ধান্ত ও বিচার মেনে চলা যেমন শরীয়তসম্মত, পক্ষান্তরে কারও মত, কারও বিচার মেনে না নেয়া কিংবা অমান্য করে চলাও তেমনি বে-আইনী এবং মারাত্মক অপরাধ বলে বিবেচিত। বলাবাহুল্য বিচারক এবং শাস্ত্রবিদদের এ ধরনের ভুল হলেও তা সাধারণেরও ভুলের মত নয়; একে বলা হয় ইজতেহাদী ভুল; তাঁদের এ ভুলও প্রশংসনীয় ও কল্যাণকর। এ তথ্যের প্রতি ইংগিত করে বর্ণিত, রয়েছে যাঁর ইজতিহাদ বা বিচারে ভুল হয়েছে তিনিও পুরস্কারে বঞ্চিত হবেন না। তিনিও একটি পুরস্কার পাবেন, পক্ষান্তরে যাঁর ইজতিহাদ সঠিক হয়েছে, তিনি পাবেন দু'টি পুরস্কার। একটি সঠিক সিদ্ধান্তে জন্য, যথাসাধ্য সাধনায় পৌছার জন্য, অপরটি সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য। (বোখারী-মুসলিম)

সাহাবাদের মতবিরোধও এ পর্যায়েরই ছিল। তাঁদের বিচারে বিরোধ কিংবা

ব্যবধান থাকলেও তা ছিল আইনসম্মত, কারও বিচারে ভুল থাকলেও তিনি ছিলেন নিরাপরাধ। ইসলামের সেবায়, ইসলামেরই বিধি-বিধান অনুযায়ী ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায়, অন্যায়ের প্রতিকারেই ছিল তাঁদের একে অন্যের বিরোধ। ইসলামী দৃষ্টি-ভংগিতেই তাঁরা নিজেকে ন্যায় এবং প্রতিপক্ষকে অন্যায় ভেবেছেন, অসৎ মনে করেন নাই। পরিস্থিতির জটিলতায় ভুল বুঝাবুঝিই এর মূল; ইতিহাস জানে-মদীনার মুনাফিক এবং তাদের উত্তরসূরীরা ইসলামের যে ক্ষতি করেছে; অন্যান্য অমুসলমান এবং মুশরিক রাষ্ট্রও ততখানি ক্ষতি করতে পারে নাই। রাসূল (সাঃ)-এর বর্তমানে মুনাফিকরা ততখানি সফল হতে না পারলেও তাদের চেষ্টার ক্রুটি করে নাই। বলাবাহুল্য এরা ছিল জাতে ইহুদী। রাসূল (সাঃ) -এর পর হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফত আমল পর্যন্ত তারা মাথা তুলতে না পারলেও হযরত উসমান (রাঃ) হত্যার নেপথ্য কুখ্যাত ইহুদী আবদুল্লাহ্ ইব্নে সাবা এ মুনাফিকদেরই উত্তরসূরী। মুখে ইসলামের মুখোশে মুসলমানদের ছদ্মবেশে সততা ও ধর্মপরায়ণতার অভিনয় করে মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং সাহাবদের বিশেষ করে হযরত উসমান (রাঃ)-এর স্বকীয়তা ও চরিত্র হননের অভিযান চালায়। হিজাজ থেকে এ ঘৃণিত প্রচার চালাতে থাকে অতি সুকৌশলে। সাধারণরা তো দূরের কথা, অনেক বিশিষ্টদের পক্ষেও তার এ দূরভিসন্ধি অনুমান করা সম্ভব হয় নাই। কুখ্যাত আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা যে বিষবৃক্ষ রোপন করেছিল, হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাহাদত তাঁর অন্যতম মর্মন্তুদ পরিণতি; এখানেই ইতি হয় নাই, বরং জমল যুদ্ধ, সিফ্ফীন যুদ্ধ প্রভৃতির পরবর্তী ঘটনাবলীই এর মর্মান্তিক পরিণাম। বলাবাহুল্য এ কুখ্যাত আবদুল্লাহ্ ইব্নে সাবার উত্তরসূরীরা আজও ইসলাম বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডে সক্রিয় রয়েছে। এরা যুগে যুগে, দেশে দেশে, নানাবেশে ইসলাম দ্রোহিতায় পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকা পালন করে চলেছে। এরা যে কত সূক্ষ্মভাবে তাদের এ প্রচার অভিযান চালায়; হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাহাদাত এবং পরবর্তী ঘটনাবলী এর জ্বলন্ত নিদর্শন; তারা সূক্ষ্ম সুকৌশলে ধারণাতীত ভাবে পরিস্থিতি এমনভাবে বিষাক্ত এবং ঘোলাটে করে, জনমনকে এমনি উত্তেজিত করে যে, সঠিক অবস্থার মূল্যায়ন করার মত মানসিকতা পর্যন্তও উত্তেজিতদের তখন লোপ পেয়ে যায়। বিচক্ষণ সাহাবাগণ হযরত উসমান (রাঃ)-এর হত্যার পরিস্থিতি মুকাবিলা করতে অসহায় হয়ে পড়েন। দূর্বৃত্তরা ভিতরে ভিতরে তাঁদের স্বকীয়তায় এমনভাবে প্রচন্ড আঘাত হানে যে; তাদের কথা বিক্ষুদ্ধ উত্তেজিত জনতা শুনতেই প্রস্তুত নয়। একমাত্র রাষ্ট্রশক্তিই তা দমন করতে পারে; কিন্তু হযরত উসমান (রাঃ) যে নিজে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তবুও একজন মুসলমানেরও রক্তপাতে উদ্যোগী ছিলেন

না। ব্যক্তিগতভাবে হযরত উসমান (রাঃ) দূরাত্মা আবদুল্লাহ্ ইব্নে সাবার দল দের লক্ষ্য ছিল না, মূল খিলাফত বরং দ্বীন ইসলামই ছিল তাদের লক্ষ্য। তাদের কাছে উসমান (রাঃ) ও যেমন, আলী (রাঃ) ও তেমন। অতঃপরও তাদের এ নির্মম খেলা চলতে থাকে। এরা ছিল জমল যুদ্ধের, সিফ্ফীন যুদ্ধের নেপথ্যের মূল নায়ক। হযরত উসমান (রাঃ)-এর পর হযরত আলী (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হলে উসমান (রাঃ) হত্যাকারী এ দূরাত্মারাই উসমান (রাঃ) দরদী হয়ে হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। শেষ হযরত আলী (রাঃ) নিজে খলীফা হবার জন্য উসমান (রাঃ) হত্যায় জড়িত ছিলেন বলে সুকৌশলে নেপথ্যে রটনা দ্বারা হযরত আলী (রাঃ) বিরুদ্ধে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত এবং বিক্ষুদ্ধ করতে থাকে। এতদুদ্দেশ্যে গুজবের পর গুজব ছড়ায়; দাবী উঠে- হযরত উসমান (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের কিসাস নিতে হবে। এর জন্যই জমল এবং সিফ্ফীন যুদ্ধে প্রতিপক্ষের নিহতদের সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তাঁদের যে কেহ শুদ্ধচিত্তে, ন্যায়-প্রেরণার নির্মলচিত্তে, নিষকলুষ অন্তরে নিহত হয়েছেন, তাঁরা জান্নাতে যাবেন! (মুকদ্দিমা ইব্নে খালদুন ২১৫ পৃঃ)।

সিফ্ফিন যুদ্ধ প্রত্যাবর্তনের পর কেহ হযরত আলী (রাঃ)-এর সম্মুখে আমীর মুআবিয়া (রাঃ)-এর বিরূপ সমালোচনা করলে তিনি বলেন, জেনে রাখ, আমীর মুআবিয়াকে হারালে তোমাদের মাথা বাঁচাতে পারবে না। মাকাল ফলের মত কর্তিত মস্তক ধড় হতে টপ টপ করে মাটিতে পড়তে থাকবে। বিশিষ্ট মণীষী আবু মুসলিম খাওলানী (রাঃ) সদলে আমীর মুআবিয়া (রাঃ)-এর সমীপে হাযির হয়ে বলেন, তুমি কি আলী (রাঃ)-এর চেয়ে বড় যে তাঁর বিরোধিতা করছ? তদুত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ, হযরত আলী (রাঃ) যে আমার অপেক্ষা অনেক উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ তাতে সন্দেহ নাই। "উসমান (রাঃ) হত্যার কিসাস" ব্যতীত তাঁর সাথে আমার কোন বিরোধ নাই; তিনি আমার চাচাত ভাই, তাঁর "কিসাস'' নেয়ার ন্যায্য অধিকার আমার রয়েছে। আলী (রাঃ) যদি হত্যাকারীগণকে আমার হাতে ছেড়ে দেন, তাহলে সর্বপ্রথম আমিই তাঁর অনুগত্যের শপথ নিব। (আল-বিদায়া ৮ম খন্ড ১৩১ পৃঃ) । বলাবাহুল্য সাহাবা জীবনের এ সমস্ত ঘটনাবলী আল্লাহ্ পূর্বাহ্নেই ইংগিত দিয়েছিলেন; রাসূল (সাঃ) যে তা জানতেন না এমন নয়; বিভিন্ন হাদীসে হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাহাদত পূর্ব হতে আরম্ভ করে সিফ্ফীন যুদ্ধ এবং নেপথ্যের খলনায়ক আবদুল্লাহ্ ইব্নে সাবা ও তদীয় পঞ্চম বাহিনী খারিজীদের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে তিনি সুস্পষ্ট আভাষ এবং যথোচিত নির্দেশ প্রদান করেছেন।

যাই হোক সাহাবাদের এ ইজতিহাদি মত বিরোধ অপরাধ নয়, তাই সাহাবাদিগকে নির্দোষী নিরপরাধ, উন্নত-আদর্শ, উম্মত-শ্রেষ্ঠ, উম্মতের পথিকৃত এবং অবশ্য অনুকরণীয় আদর্শ, মুক্তিপথের মানদণ্ড, সত্যের এবং ন্যায়ের পরাকাষ্ঠা বলে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন। যেহেতু সাহাবা জীবনের এ ধারনের মত বিরোধ বিচার-পার্থক্য এবং ন্যায়-দ্বন্ধকে ইসলাম দ্রোহীরা তাদের জঘন্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সুপরিকল্পিত এবং নিপুণভাবে ব্যবহার করবে, এর দ্বারা সাহাবাদের স্বকীয়তা বিনষ্ট ও চরিত্র হননের অপপ্রয়াস পাবে, এমতাবস্থায় মুসলমানেরা যাতে সাহাবাদের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়, তাঁদের সম্পর্কে অসতর্ক, অসংযত আলোচনা করে নিজের দ্বীন দুনিয়া বিনষ্ট না করে, তজ্জন্যই পূর্বাহ্নেই কঠোর নির্দেশ প্রদান করে রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ্‌র দোহাই, "তোমরা আমার সাহাবাদের প্রতি বাক্যবাণ নিক্ষেপ কর না। তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করবে, ভালবাসবে; তাঁদের প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং বিদ্বেষ পোষণে বিরত থাকবে। মনে রাখবে তাঁদের প্রতিটি আচরণ, বিদ্বেষ, ভালবাসা এবং বিরূপ মনোভাব প্রকৃতপক্ষে আমারই মধ্যে পরিগণিত হবে। আমার সাহাবাদের আলোচনায় তোমরা সতর্ক ও সংযত থাক। আমার সাহাবাদের ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করে চল। আমি কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে রক্ষা করব।"

আহ্‌লে বাইতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ঃ রাসূল (সাঃ)-এর সম্মানের পর তাঁর পরিবারবর্গকেও সম্মানের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। মহান আল্লাহ্ কুরআনে রাসূল (সাঃ)-এর আহলে বাইতের প্রশংসায় বলেন–"আল্লাহ্ চান হে আহলে বাইত! তোমাদের থেকে পঙ্কিলতাকে দূরে রাখতে এবং তোমাদেরকে পাক-পবিত্র রাখতে।" হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত রয়েছেঃ "রাসূল (সাঃ)-এর সমস্ত সহধর্মিনীগণ, আহলে বাইতের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।" আল্লাহ্ রাসূল (সাঃ)-এর সহধর্মিনীগণের মর্যাদা বর্ণনায় বলেন–"আর তাঁর সহধর্মিনীগণ তাঁদের (মুমিনদের) মা।" আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূল (সাঃ)-এর সহধর্মীনীগণকে মুমিনদের মা বলে আখ্যায়িত করার প্রকৃত অর্থ মায়ের সম্মান ও শ্রদ্ধা যেমন অপরিহার্য তদ্রুপ তাঁদের সম্মান এবং শ্রদ্ধাও তেমনি অপরিহার্য।হযরত যায়েদ ইব্‌নে আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন–"আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বাইতের সম্মান করা এবং তাঁদের সাথে সদাচার করার জন্য আল্লাহ্‌র কসম দিচ্ছি।" এ বাক্যটি তিনবার রাসূল (সাঃ) উচ্চারণ করেছেন।

কারা আহ্‌লে বাইত ঃ লোকেরা যায়েদ ইব্‌নে আরকাম (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, আহলে বাইত কারা? তিনি বলনে, আলী (রাঃ)-এর বংশধর, যা'ফর (রাঃ)-এর বংশধর, আকীল (রাঃ)-এর বংশধর ও আব্বাস (রাঃ)-এর বংশধরগণ। আহলে বাইতকে চিনার অর্থ রাসূল (সাঃ)-এর সাথে তাঁদের বংশগত এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক কি ধরনের তা জানা। যাতে সে অনুপাতে তাঁদের সম্মান করা যেতে পারে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন– "আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বিষয় রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ এ দু'টিকে আঁকড়িয়ে ধরবে ততক্ষণ তোমরা গোমরাহ হবে না। কিতাবুল্লাহ এবং আমার আহলে বাইত। অতএব তোমরা চিন্তা কর আমার পর তাঁদের হক আদায়ের ব্যাপারে তোমরা কিরূপ আচরণ করবে? "রাসূল (সাঃ) আহলে বাইতকে চিনা জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের ওসীলা। তাঁদেরকে ভালবাসা পুলসিরাত অতি সহজে অতিক্রম করার কারণ এবং তাঁদের সাহায্য করা আযাব থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। বহু হাদীসে আহলে বাইতের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেগুলো দ্বারা তাঁদের সম্মান করা জরুরী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আহলে বায়তের প্রতি সম্মানঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ হাসান (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমি কোন এক প্রয়োজনে উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ)-এর কাছে যাওয়াতে আমাকে দেখে তিনি বললেন, আপনার কোন প্রয়োজন দেখা দিলে অন্য কাউকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিবেন অথবা একটি লিখে পাঠাবেন। আপনি নিজে কষ্ট করে আসবেন না। কেননা আল্লাহ্ আপনাকে আমার দরজায় দেখবেন অথবা আমি আপনাকে আমার দরজায় দেখব এটা আল্লাহ্‌র দরবারে আমার জন্য সত্যিই লজ্জার বিষয়।

হাকেম শা'বী বর্ণনা করেন, যায়েদ ইব্‌নে সাবিত (রাঃ) আপন মায়ের জানাযা আদায় করলেন। নামাযান্তে তাঁর সওয়ারী আনা হল। ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) সওয়ারীর লাগাম ধরলেন। তখন যায়েদ ইব্‌নে সাবিত (রাঃ) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, 'হে রাসূলুল্লাহ্‌র চাচাত ভাই! আপনি লাগাম ছেড়ে দিন। তখন ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বললেন, আমাদেরকে আলেমদের এরূপ সম্মান করতেই আদেশ করা হয়েছে।' যায়েদ ইব্‌নে সাবিত (রাঃ)-এটা শুনে তাঁর হাত চুম্বন করে বললেন, আমাদেরকেও আহলে বাইতের প্রতি এরূপ সম্মান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রাঃ)-এর ঘটনা ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে ওমর (রাঃ) একদিন মুহাম্মদ ইব্‌নে উসামাকে দেখে বললেন, এ যদি আমার গোলাম হত! জনৈক ব্যক্তি বলল, এত উসামার পুত্র। একথা শুনে তিনি লজ্জায় মাথা নত করে অনুতপ্ত হয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করে বললেন, যদি রাসূল (সাঃ) তাঁকে দেখতেন তাহলে অত্যন্ত ভালবাসতেন। যেহেতু তাঁর পিতা ও পিতামহকেও তিনি ভালবেসেছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইব্‌নে আসাকির লিখেন, উসামা (রাঃ)-এর কন্যা একদিন ওমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রাঃ)-এর কাছে গেলেন। বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে তাঁর গোলাম তাঁকে হাত ধরে নিয়ে যায়। উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ) তাঁকে দেখামাত্রই দাঁড়িয়ে সংবর্ধনা জানিয়ে নিজের জায়গায় বসিয়ে তাঁর প্রয়োজনাদি মিটালেন। আহ্‌লে বাইতের সাথে রাসূল (সাঃ)-এর মধ্যে তাঁর সাহাবী (রাঃ)-গণের সম্মানও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। কুরআন-হাদীসে যদি তাঁদের ফযীলত ও মহত্ত্বের বিষয় বর্ণনা নাও করা হত, তথাপি তাঁদের সম্মান অপরিহার্য হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে, তাঁরা ছিলেন রাসূল (সাঃ)-এর অন্তরঙ্গ সহচর।

তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন–"আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তাঁরাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট।" আল্লাহ্ বলেন–"মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্ রাসূল। আর যাঁরা তাঁর সাহচর্য লাভ করেছে তাঁরা কাফেরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর আর নিজেদের পরস্পরে অত্যন্ত সদয়। তুমি তাঁদেরকে দেখতে পাবে কখনও রুকু করছে; কখনও সিজদা করছে। তাঁরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যাপৃত। সিজদার দরুন তাঁদের চেহারায় বিশেষ নিদর্শন দীপ্তিমান। যাঁরা ঈমান এনে নেক কাজ করেছে তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্ মাগফিরাত এবং বিরাট প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন।" "আর যারা তাঁর সাহচর্য লাভ করেছে" এ বাক্যে আল্লাহ্ সাহাবায়ে কিরামের জন্য রাসূল (সাঃ) সাহাচর্য যে অতি মর্যাদার বিষয় তা বর্ণনা করেছেন। আর এটা এমন মর্যাদা যার সমতুল্য আর কিছু নেই। আর আয়াতে কারীমায় সাহচর্য ও সঙ্গ দ্বারা কায়িক ও কালিক সঙ্গ বুঝানো হয় নাই। কারণ এটা তো কাফেরদেরও লাভ হয়েছিল। বরং বিশেষ সঙ্গ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ঈমান আনয়নের সাথে সাথে তাঁরা সাহায্য-সহযোগিতায়ও রাসূল (সাঃ)-এর সাথে রয়েছেন। এ বিষয় অবশ্য অন্য বাক্য দ্বারাও ব্যক্ত করা যেত

কিন্তু বিশেষ করে উপরোক্ত বাক্য দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁরা সারা জীবন প্রতি মুহূর্তে কায়িক, আর্থিক সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতায় রাসূল (সাঃ)-এর সাথে রয়েছেন। অন্য কোন বাক্য দ্বারা এটা লাভ হত না। "কাফেরদের বিরুদ্ধে অতি কঠোর" এ বাক্যটি দ্বারা সাহাবায়ে কিরামের প্রচেষ্টা, জিহাদ ও ত্যাগের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এছাড়া আল্লাহ্‌র উপর তাঁদের পূর্ণ তাওয়াক্কুল বা ভরসা থাকার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ সংখ্যায় মুষ্টিমেয় এবং অস্ত্রে অপ্রতুল হওয়া সত্ত্বেও সর্বপ্রকার অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত কয়েক গুণ বেশী কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়া আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকা ব্যতীত সম্ভব নয়। এ বিষয়টিও অন্য বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যেত কিন্তু বিশেষ করে বিশেষ্যবাচক বাক্য এনে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, তাঁরা সারা জীবনই উক্ত গুণে গুণান্বিত ছিলেন। এমন নয় যে, কখনও উক্ত গুণ প্রকাশ পেল আবার কখনও প্রকাশ পেল না। "তারা পরস্পর অত্যন্ত সদয় ছিল" এতে আল্লাহ্ তায়ালা সাহাবায়ে কিরামের পরস্পর ভালবাসা, সম্প্রীতি, দয়া প্রভৃতি সুসম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এক্ষেত্রেও বিশেষ্যবাচক বাক্য আনয়ন করতঃ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁরা সারাজীবন পরস্পর ভালবাসা, দয়া ও হৃদ্যতার ভিতর দিয়ে কাটিয়েছেন। জীবনের প্রতি মুহূর্তে এগুণে গুণান্বিত ছিলেন। কখনও এ গুণ থেকে বিচ্যুত হন নাই। কখনও যদি তাঁদের পরস্পরে কোন মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে তা ছিল ইজতেহাদী। অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজকে হকের উপর মনে করেছেন। আর এর পিছনে তাঁদের যুক্তিও ছিল। শুধু প্রবৃত্তির তাড়নায় করেছেন তা নয়। আর এটা কারো পক্ষে তখনই সম্ভব যখন সমস্ত মন্দ চরিত্র যথা, অহংকার, কার্পণ্য, ক্রোধ, হিংসা, লোভ, মর্যাদা, মোহ ইত্যাদি থেকে মুক্ত হয়ে উত্তম চরিত্র যথা, বিনয়, দানশীলতা, অল্পেতুষ্টি, ইখলাস প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত হতে পারে এবং এগুলো তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। উল্লেখিত বর্ণনায় সাহাবায়ে কিরামের মন্দ চরিত্রসমূহ থেকে মুক্ত হওয়া এবং উত্তম চরিত্রসমূহ্ দ্বারা সুসজ্জিত হওয়া প্রমাণিত হচ্ছে। "তুমি তাঁদের দেখতে পাবে রুকু করছে, সিজদা করছে" এ বর্ণনায় সাহাবায়ে কিরামের ইবাদতের অধিক্য বর্ণনা করেছেন যে, তুমি তাদেরকে যখনই দেখ তখন তাদেরকে ইবাদতরত দেখতে পাবে। ইবাদতের আধিক্য তখনই সম্ভব যখন ইবাদতে স্বাদ অনুভব

হয়। আর ইবাদতে স্বাদ অনুভব হয় ইহসানের মাধ্যমে। ইহসানের অর্থ হচ্ছে, ইবাদত এভাবে করা যেন আমি আল্লাহ্‌কে স্বচক্ষে দেখছি। এ অবস্থা সৃষ্টি না করতে পারলে কমপক্ষে এতটুকু হওয়া চাই যে, আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে দেখছেন। যখন বান্দার মধ্যে এ অবস্থার পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায় তখন সে ইবাদতে স্বাদ অনুভব করে। আর তখনই অধিক পরিমাণে ইবাদত করতে পারে। অনন্তর তার মধ্যে এমন এক স্থায়ী অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়, যার ফলে গোনাহর প্রতি ঘৃণা ও নেক কাজের প্রতি আগ্রহ জন্মে। তখন সর্ব কাজে তার একমাত্র লক্ষ্য থাকে আল্লাহ্ সন্তুষ্টি। এখানে এটাই বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ "তাঁদের জীবনের লক্ষ্যই ছিল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং সন্তুষ্টি অর্জন। এটাই ছিল তাঁদের প্রত্যেক কাজের উদ্দেশ্য। যদি তাঁদের পরস্পরে কখনও মতপার্থক্যের সৃষ্টি হত তাহলে সেক্ষেত্রে প্রত্যেকের লক্ষ্য থাকত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। আর নিয়ত থাকত সম্পূর্ণ নির্ভেজাল। তাঁদের প্রত্যেক কাজে ইখলাস ও সৎ নিয়ত থাকার বিষয়টি কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় "সিজদার দরুণ তাঁদের চেহারায় বিশেষ নিদর্শন দীপ্তিমান।" কোরআনের আয়াতে অধিক ইবাদত ও ইখলাসের দরুণ সাহাবায়ে কিরামের চেহারায় যে রূপ চমকাত তা বর্ণনা করা হয়েছে। "যাতে তাঁদের দ্বারা কাফেরদেরকে ক্ষুব্ধ করেন" কোরআনে বর্ণিত এ বাক্য দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে কাফেরদেরকে ক্ষুব্ধ করা। অতএব কাফেররা সাহাবায়ে কিরামের প্রতি সর্বদা ক্ষুব্ধ থাকবে এবং তাঁদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে। "যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে" কোরআনে বর্ণিত এ বাক্যে সাহাবায়ে কিরামের ঈমান ও সমস্ত আমল আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। "তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্ মাগফিরাত ও বিরাট প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন" এ বাক্যে সাহাবায়ে কিরাম থেকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পরিপন্থী কোন কাজ হলে তা ক্ষমা করে দেয়ার ওয়াদা এবং ক্ষমার সাথে সাথে বিরাট প্রতিদান দেয়ার প্রতিশ্রুতিও করা হয়েছে। আর আল্লাহ্ যাঁদেরকে বিরাট প্রতিদানে আখ্যা দিয়েছেন, তা কত মহান হবে সেটা কল্পনাও করা যায় না।

সাহাবায়ে কিরাম অনুসৃত ব্যক্তিবর্গ এবং সত্যের মাপকাঠি ঃ আল্লাহ্ বলেনঃ "আর সেসব মুহাজির ও আনসার ঈমান আনয়নের ব্যাপারে প্রবীণ ও

প্রথম পর্যায়ের এবং যাঁরা ইখলাসের সাথে তাঁদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ্ তাঁদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁদের জন্য এমন বাগানসমূহ তৈরী করে রেখেছেন যেগুলোর তলদেশে ঝর্না প্রবাহিত হবে, যেগুলোতে তাঁরা চিরকাল অবস্থান করবে। এটা অতি মহান কামিয়াবী।" কোরআনের উল্লেখিত আয়াতে সাহাবায়ে কিরামের মহত্ত্ব প্রমাণ হওয়ার সাথে সাথে এটাও প্রমাণ হচ্ছে যে, তাঁরা পরবর্তীদের জন্য অনুসৃত ব্যক্তিবর্গ। যাঁরা তাঁদের অনুসরণ করবে আল্লাহ্ তাঁদেরকেও আপন সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন। অবশ্য প্রথম স্তরের এবং সরাসরি অনুসারী তাবেয়ীন প্রথম পর্যায়ে রয়েছেন। আর আয়াতের ব্যাপাকতার দিকে লক্ষ্য করা হলে কিয়ামত পর্যন্ত যতলোক আসবে এবং সঠিকভাবে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে সবাই তাঁদের অনুসারী হিসাবে গণ্য এবং উক্ত সুসংবাদ করার জন্যই। অতএব প্রত্যেক সাহাবীর আদর্শ অনুসরণযোগ্য এবং সত্যের মাপকাঠি এ বিষয়টি প্রমাণিত হল। রাসূল (সাঃ) এ বিষয়টি নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণনা করেছেন—"আমার সাহাবীরা নক্ষত্রসদৃশ। তাঁদের মধ্যে তোমরা যে কারো অনুসরণ করবে হিদায়াত পাবে।"

সাহাবায়ে কিরামের উন্নত গুণাবলী ঃ আল্লাহ্ এবং রাসূল, পবিত্র কুরআন এবং হাদীসে শুধুমাত্র সাহাবদের সামগ্রিক প্রশংসা এবং মর্যাদা ঘোষণা করেই বিরত থাকেন নাই, সু-নির্দিষ্টভাবে অনেকের প্রশংসাও করেছেন। সাহাবী হিসাবে প্রত্যেকের মর্যাদা সমান হলেও আনুপাতিক মর্যাদা ভেদ ও স্তরভেদ তাঁদের মধ্যে রয়েছে সন্দেহ নাই। "এসব ঈমানদারের মধ্যে কতক লোক এমন রয়েছেন, যাঁরা আল্লাহ্‌র সাথে যে অঙ্গীকার করেছিল তাতে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। অনন্তর তাঁদের মধ্যে কতক লোক এমন, যারা আপন মানত পূর্ণ করে ফেলেছে। আর কতক তার অপেক্ষায় রয়েছে। আর তারা সামান্য একটু পরিবর্তনও ঘটায় নাই।"এ আয়াত দ্বারা সাহাবায়ে কিরামের বহু গুণের কথা প্রমাণিত হয়েছে। যথা—

(১) সততা ও অঙ্গীকারে দৃঢ়তা। কারণ, তারা আল্লাহ্ এবং রাসূল (সাঃ)-এর সাথে যেসব ওয়াদা করেছেন সেগুলো পূরণ করেছেন।

(২) স্বীয় জান-মাল বিসর্জন দিয়ে শাহাদতের মর্যাদালাভ করা তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। কারণ "যাঁরা আপন মানত পূরণ করে ফেলেছেন।" এসব লোকের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে, যাঁরা শাহাদত বরণ করেছেন।

(৩) সাহাবায়ে কিরাম শাহাদাত বরণ করার জন্য উৎসুক ও প্রতীক্ষমান ছিলেন। "কতক তার অপেক্ষায় রয়েছে" এতে এটাই বর্ণনা করা হয়েছে।

(৪) এসব গুণ তাঁদের মধ্যে সাময়িকভাবে ছিল না বরং স্থায়ীভাবে ছিল। আমরণ তাঁরা এসব গুণে গুণান্বিত ছিলেন। এতে কোনরূপ পরিবর্তন আসে নাই : "তাঁরা সামান্য একটু পরিবর্তনও ঘটায় নাই।'–এর দ্বারা এটাই বর্ণনা করা হয়েছে।

সাহাবায়ে কিরামের আরও কয়েকটি মহৎ গুণঃ "কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে ঈমানের ভালবাসা দান করেছেন এবং তা তোমাদের অন্তরে পছন্দনীয় করে দিয়েছেন আর কুফর, এবং গোনাহকে তোমাদের কাছে অপছন্দীয় করে দিয়েছেন। বস্তুতঃ এসব লোক সরল ও সঠিক পথের উপর রয়েছে।"

উক্ত আয়াত দ্বারাও সাহাবায়ে কিরামের কতিপয় মহামান্বিত গুণ প্রমাণিত হয়েছে।

(১) আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদের ঈমানকে প্রিয় বস্তু করে দিয়েছেন।

(২) ঈমান তাঁদের অন্তরে সুসজ্জিত করে দিয়েছিলেন।

(৩) কুফর এবং অন্যান্য সমস্ত নাফরমানীর প্রতি তাঁদের অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যখন কারো মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যাবে তখন তার জন্য ঈমানের সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করা এবং গোনাহ থেকে বিরত থাকা অনিবার্য বিষয় হয়ে যাবে। অতএব আল্লাহ্ যাঁদের সাথে এ ধরণের আচরণ করেছেন তাঁদের অনুসরণীয় হওয়ার ব্যাপারে এবং সত্যের মাপকাঠি হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণের কোন অবকাশ থাকতে পারে কি? "আর এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে এক উম্মত (সম্প্রদায়) সৃষ্টি করেছেন। যাঁরা (প্রত্যেক বিষয়ে) মিতাচার।" এ সম্বোধনের প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে সাহাবায়ে কিরাম। স্বয়ং আল্লাহ্ যাঁদের মিতাচার হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন, তাঁরা সত্যের মাপকাঠি না হলে আর কে হবে? বোখারী শরীফে উল্লেখিত আয়াতে তাফসীরে 'ওসাতান' এর অর্থ করা হয়েছে 'ন্যায়পরায়ণ'। যদ্দ্বারা সাহাবায়ে কিরামের ন্যায়পরায়ন হওয়ার বিষয় প্রমাণিত হয়। অতএব আল্লাহ্ যাঁদের সম্পর্কে ন্যায়পরায়ণ ও মিতাচার হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন তাঁদের সম্পর্কে দুর্নীতি পরায়ন ও অমিতাচার বলে আখ্যায়িত করা কতটুকু অন্যায় তা সামান্য ঈমান ও সাধারণ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিও উপলব্ধি করতে সক্ষম। "আর যারা তাঁদের পরে আসে এবং এ দো'আ করে যে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের সে সকল ভাইকেও ক্ষমা করে দাও যাঁরা আমাদের পূর্বে ঈমান আনয়ন করেছেন।"

সাহাবায়ে কিরামের জন্য দো'আ ঃ উল্লেখিত আয়াতে "যাঁরা আমাদের পূর্বে ঈমান আনয়ন করেছেন" দ্বারা সাহাবায়ে কিরামকে বুঝানো হয়েছে।

তাঁদের জন্য দোয়া করাকে আল্লাহ্ তায়ালা অত্যন্ত পছন্দ করেছেন। এতেও আল্লাহর্ কাছে তাঁদের বিরাট মর্যাদা রয়েছেন, সেটা প্রকাশ পাচ্ছে। কুরআনের বহু আয়াতে সাহাবায়ে কিরামের মহত্ত্ব ও মর্যাদার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। সাহাবা (রাঃ)-গণ শুধু রাসূল (সাঃ)-এর সহচরই ছিলেন না। তাঁদের জীবনে বিভিন্ন গুনাবলীর সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। যেমন তাঁরা ছিলেন রাসূল প্রেমিক, সুখ-দুঃখের সাথী, হিযরতকারী, সৈনিক, জ্ঞান বিতরণকারী, কাতেরে ওহী, কাতেরে হাদীস, কুরআন হাদীসের সংকলক, শাসক, কবি, রাষ্ট্রপরিচালক, ইসলাম প্রচারক, দূত, দোভাষী, চাষী, পরপকারী, সংসারী, দাতা, চিকিৎসক, নাবিক, সৎকাজে উৎসাহী অসৎ কাজে বাধা দানকারী, ব্যবসায়ী, বিচারক, গুপ্তচর, জিহাদে অংশগ্রহণকারী মোট কথা মানবিক যে সমস্ত গুনাবলীর প্রয়োজন সব গুলোই তাঁদের জীবনে সন্নিবেশিত হয়েছিল। এ সমস্ত মহতী কাজে রাসূল (সাঃ)- এর শুধু পুরুষ সাহাবীই সম্পৃক্ত ছিলেন না অনেক জ্ঞানী-গুণী, মহিলা সাহাবীও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

সাহাবায়ে কিরাম নবীগণের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ঃ রাসূল (সাঃ) বলেছেন– "আল্লাহ্ আমার সাহাবীগণকে নবী রাসূল ছাড়া সমস্ত জগতের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আর তন্মধ্যে আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ), উসমান (রাঃ) ও আলী (রাঃ) এ চারজনকে উম্মতের জন্য মনোনীত করেছেন। তাঁদরেকে সাহাবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করেছেন আর আমার প্রত্যেক সাহাবীর মধ্যেই শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।" রাসূল (সাঃ) বলছেন–আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে এবং হোদাইবিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণ কারীদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতএব আমার সাহাবীগণ, আমার শ্বশুরপক্ষীয় আত্মীয়-স্বজন ও আমার জামাতাদের ব্যাপারে অমার রেয়াত কর। তাঁদের মধ্য হতে কেউ যেন কোন জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণের দাবী না করে। কারণ এটা এমন জুলুম, কাল-কিয়ামতের দিন যার কোন বিনিময় দেয়া সম্ভব হবে না।" এক হাদীসে আছে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'যে আমার রেয়াত করেছে আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরতে তাঁকে হিফাযত করবেন। আর যে আমার রেয়াত করে নাই আল্লাহ্ তার থেকে মুক্ত। আর আল্লাহ্ যার থেকে মুক্ত থাকেন অচিরেই তাকে গ্রেফতার করবেন।'

সাহাবায়ে কিরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী কাফের ঃ ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কিরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে কাফের।' আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন– "তাদের দ্বারা কাফেরদেরকে ক্ষুব্ধ করেন।"

মুক্তি লাভের দু'টি বিশেষ গুণ ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্নে মোবারক (রহঃ) বলেন, 'যার মাঝে দু'টি বিষয় পাওয়া যাবে সে নাযাত পাবে।' একটি হচ্ছে, আল্লাহ্ এবং তাঁর সৃষ্টির শানে সততা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে মুহাম্মদ (সাঃ) প্রতি ভালবাসা।

হযরত উসমান (রাঃ)-এর প্রতি বিদ্বেষের পরিণতি ঃ তিরমিযী শরীফের এক হাদীস বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ)-এর কাছে জানাযার নামায পড়ার জন্য জনৈক ব্যক্তির লাশ আনা হল। কিন্তু তিনি ঐ ব্যক্তির জানাযার নামায পড়লেন না। এর কারণ স্বরূপ বললেন, এ ব্যক্তি উসমানের প্রতি বিদ্বেষ রেখেছে, আমিও তার প্রতি বিদ্বেষ রাখি। আনসারী সাহাবীগণ সম্বন্ধে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'তোমরা তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দাও আর তাঁদের গুনাবলী স্বীকার কর।' সাহল ইব্নে আবদুল্লাহ বলেন—"যে ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-কে সম্মান করে নাই এবং তাঁর আদেশ সমূহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে নাই সে রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনে নাই।" আলোচ্য আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা সাহাবায়ে কিরামের অগণিত গুণ-মর্যাদা ও মহত্ত্ব প্রমাণিত হয় যেগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন একান্ত জরুরী। এর পর রাফেযী, বিদআতপন্থী, ভ্রান্তসম্প্রদায় এবং অনির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারীগণ সাহাবায়ে কিরামের পরস্পর মতবিরোধ সম্পর্কিত যেসব ঘটনাবলী বিকৃত ও অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করেছে সেগুলো প্রত্যাখ্যান করতে হবে অথবা সেগুলোর উপযুক্ত কোন ব্যাখ্যা করতে হবে। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবী (রাঃ)-গণের পূর্ণ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নসীব করুন। আর তাঁদের সম্বন্ধে তাঁদের মান-মর্যাদার পরিপন্থী কোন একটি শব্দও উচ্চারণ করা থেকে আমাদের হিফাযত করুন। আমীন ॥ —(সংকলিত)

তথ্যসূত্রঃ
(১) সাহাবাদের মান- মাওলানা মোহাম্মদ তাহির।
(২) হুকুকুল মোস্তফা (সাঃ) অনুবাদ- মুফতী মুহাম্মদ উবাদুল্লাহ।
(৩) জীবন সায়হ্নে মানবতার রূপ- মাওলানা আবুল আলাম আযাদ।
(৪) সাহাবায়ে কিরাম সত্যের মাপকাটি।
(৫) ইসনলামের ইতিহাস- বিভিন্ন লেখক কর্তৃক লিখিত।
(৬) তারিখে খিলাফতে রাশেদা- বঙ্গানুবাদ।
(৭) তারিখে হাবীবে ইলাহ- বঙ্গানুবাদ
(৮) বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রসঙ্গ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বীনের জন্য কষ্টভোগ ও নির্যাতন সহ্য ও লক্ষনীয় ঘটনা

দ্বীনের জন্য হযরত রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) যে নির্যাতন ও কষ্ট ভোগ করেছেন তা ভোগ করা আমাদের মত অধমদের পক্ষে অসম্ভব তো বটেই বরং চিন্তা করাও কষ্টকর। অথচ তাঁদের সে হৃদয় বিদারক ঘটনা ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ। তাঁদের পদঙ্ক অনুসরণের কষ্ট ভোগ তো দূরে থাক, বরং সে সব ঈমান বর্ধক ঘটনা জানার কষ্টটুকু করতেও আমরা রাজী নই। এ অধ্যায়ে নমুনা স্বরূপ কিছু ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, এর মধ্যে প্রথম ঘটনাটি স্বয়ং রাসূল (সাঃ)-এর বরকতের জন্য উল্লেখ করা হল। রাসূল (সাঃ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর রাসূল (সাঃ) সুদীর্ঘ নয়টি বছর মক্কা মুকাররমায় দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে জাতির হিদায়াত ও সংশোধনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলেন, কিন্তু এতে অল্প সংখ্যই মসুলমান হলেন আর কিছু অমুসলমান হৃদয়বান ব্যক্তি তাঁকে সাহায্য করলেন। অধিকাংশ মক্কার কাফের-ই-তাঁকে ও তাঁর সাহাবাদেরকে নানাবিধ যন্ত্রণা ও কষ্ট দিতে থাকে। কাফেররা হাসি, ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করে বিভিন্ন ভাবে অপমানিত করত। রাসূল (সাঃ)-এর চাচা আবু তালিবও এ নেক লোকদের অর্ন্তভূক্ত ছিলেন। যিনি অমুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা সম্প্রসারিত করেছিলেন। নবুওয়তের দশম বছর যখন আপন পিতৃব্য আবু তালিবের ইন্তিকাল হয় তখন কাফেরদের শক্তি-সাহস প্রচন্ডরূপে বেড়ে যায়। তখন তাদের প্রকাশ্যে সুয়োগ সৃষ্টি হল অত্যাচার করার ও ইসলামে বাধা দেয়ার। রাসূল (সাঃ) একবার এ ভেবে তায়েফে তাশরীফ আনলেন যে, সেখানে শক্তিশালী সাকী গোত্রের লোকেরা যদি মুসলমান হয়, তাহলে মুসলমানগণ কাফেরদের অত্যাচার থেকে নিস্কৃতি পাবে এবং মুসলমানদের শক্তিও বৃদ্ধি পাবে। তিনি সেখানে পৌঁছে, সে গোত্রের তিনজন নেতার সাথে সাক্ষাত করে তাদেরক ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে আল্লাহ্র রাসূলকে সহায়তা করার অনুরোধ করলেন। কিন্তু এরা দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করা দূরে থাক, অন্তত আরবদের চিরাচরিত মেহমানদারীর প্রথার প্রতিও লক্ষ্য না করে, একজন নবাগত মেহমানের সম্মান করার প্রয়োজনটুকুও বোধ করল না বরং খুবই নির্দয় ও অভদ্রোচিত আচরণ করল এবং তাঁর অবস্থান কেউ সহ্য করতে পারল না। রাসূল (সাঃ) যাদেরকে জ্ঞানী গুণী ভেবে কথা বলেছিলেন,

তাদের মধ্যে একজন বলল "ওহে আল্লাহ্ কি শেষ পর্যন্ত তোমাকেই নবী করে পাঠালেন?" আরেকজন বলল, "আল্লাহ্ নবী করে পাঠাবার জন্য বুঝি আর লোক পেলেন না?" তৃতীয় ব্যক্তি বলল, "তোমার সাথে আমি কথা বলতে চাইনা, কেননা, যদি তুমি আমার দাবী অনুযায়ী সত্য হও, তাহলে তোমাকে অমান্য করলে ধ্বংস অবধারিত" আর যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তাহলে আমি এরূপ লোকের সাথে কথা বলতে চাইনা, এর পর রাসূল (সাঃ) তাদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে অন্যাদের সাথে কথা বলতে চাইলেন। তিনি তো দৃঢ়তা ও সাহসের পাহাড় ছিলেন। কিন্তু কেহই দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করল না বরং দ্বীন গ্রহণ করার পরিবর্তে তারা রাসূল (সাঃ)-কে বলল তুমি এক্ষুণি আমাদের শহর থেকে বের হয়ে যেখানে খুশি চলে যাও। রাসূল (সাঃ) যখন তাদের ব্যাপারে পুরোপুরি নিরাশ হয়ে ফিরতে লাগলেন তখন তারা শহরের ছেলেদের লেলিয়ে দিয়ে তারা হাসি ঠাট্টা করতে থাকে, তালী বাজাতে থাকে, পাথর মারতে থাকে। এ অত্যাচারে তিনি রক্তে রঙিন হয়ে গেলেন। এভাবেই তিনি ফিরছিলেন, পথিমধ্যে যখন এ দুষ্টদের থেকে পরিত্রাণ পেলেন, তখন রাসূল (সাঃ) একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করলেনঃ "হে আল্লাহ্! তোমার দরবারে আমার দুর্বলতা, অসহায়ত্ব এবং লোকদের মধ্যে অপমান, লাঞ্ছনার ফরিয়াদ করছি। হে আরহামুর রাহিমীন! আপনি-ই সকল দূর্বলের মালিক এবং আমার প্রতিপালক। আপনি আমাকে কার সোপর্দ করছেন? যদি আপনি আমার উপর নারাজ না থাকেন তাহলে আমি কারও প্রতি ভ্রুক্ষেপ করব না, আপনার রক্ষণাবেক্ষণই আমার জন্য যথেষ্ট। আপনার মুখের ঐ আলোকোজ্জল প্রভা যার সাহায্যে জমাট আঁধার হয় বিদূরিত। যার সাহায্যে পৃথিবীর সকল কর্ম সাধিত ও সম্পাদিত, সে আলোর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনার ক্রোধ থেকে পানাহ চাই। আপনার অসুন্তুষ্টি দূর না হওয়া পর্যন্ত আমি ফরিয়াদ করেই যাব। সকল ক্ষমতা, সকল শক্তি শুধুই আপনার। রাহমাতুল্লিল আলামিনের এ ফরিয়াদ যেন দয়ার সাগর রাহমানুর রাহিমের কাছে সাদরে গৃহিত হল। সুমহান আল্লাহ্ তাঁর আবেদনে হযরত জিব্‌রাইল (আঃ)-কে পাঠালেন। তিনি এসে বললেন, আল্লাহ্ আপনার ও আপনার গোত্রের লোকদের সকল কথাবার্তা ও আপনার সাথে তাদের দুর্ব্যবহার ও অত্যাচার সম্বন্ধে ভাল ভাবেই অবগত, তাই তিনি ফেরেশতাকে প্রেরণ করেছেন, আপনি যদি ইচ্ছা করেন আদেশ করুন। অতঃপর একজন ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সালাম করে বললেন, যা আদেশ করবেন তাই পালন করব। যদি আদেশ হয় উভয় দিকের পাহাড়গুলোকে দু'দিক থেকে চাপিয়ে দিব,

যাতে শত্রুরা সকলে পিষে যাবে নতুবা আপনি যে সাজা নির্ধারণ করেন। রাহমাতুললিল আলামীন (সাঃ) বলেন "আমি আল্লাহ্‌র কাছে আশাবাদী যদিও এরা দ্বীন কায়েম করে নাই কিন্তু তাদের বংশে এরকম লোক তৈরী হবে, যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগী করবে। এ ছিল রাসূল (সাঃ)-এর চরিত্র, আমরা যাঁর উম্মত দাবী করি। কেহ অল্প একটু কষ্ট দিলে বা সামান্য গালি দিলে এমন ক্রোধান্ধ হয়ে পড়ি যে, প্রতিশোধ নিয়েই শান্ত হই। সাধারণ অত্যাচারের পরিবর্তে দ্বিগুণ অত্যাচার করি, সে সাথে নবীর উম্মত বলে দাবীও করে থাকি। নিজেদেরকে নবীর অনুসারী বলে বেড়াই। অথচ রাসূল (সাঃ) এত কঠিন যাতনা ভোগ করার পরও কতটুকু সহনশীলতার পরিচয় দিলেন এবং নিষ্পেষনের যাতাকলে পিষ্ট হয়েও প্রতিশোধ গ্রহণ করা তো দূরের কথা, সামান্যতম বদ দোয়া পর্যন্ত না করে তাদের জন্য দোয়া করলেন।

পঞ্চম মতান্তরে অষ্টম হিজরীতে ঘটনাটি ঘটেছিল। হযরত রাসূল (সাঃ) হযরত আবূ উবাইদ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-এর অধীনে মুহাজিদ-আনসারসহ সম্মিলিত তিনশ মুজাহিদের একটি বাহিনী মাদীনা হতে পাঁচ দিনের পথে সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে বসবাসকারী জুহাইনা কওমের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ঘটনাক্রমে এ যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়ে। মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ আহার্য ছিলনা বলে ক্রমশঃ তাঁদের গভীর খাদ্য সংকটে পড়তে হয়েছিল। প্রথম দিকে দৈনিক তিনটি করে উট যবেহ করা হচ্ছিল, কিন্তু সওয়ারী কমে যাওয়ার আশংকায় উট যবেহ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হয়। তখন বরাদ্ধ হতে থাকে জনপ্রতি কিছু কিছু খেজুর কিন্তু যখন তাতেও অনটন দেখা দেয়, তখন বরাদ্ধ হল মাথাপিছু একটি খেজুর। তা চুষে পানি পান করে মুজাহিদগণ জিহাদ করতে থাকেন। যখন খেজুরও নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন সৈনিকগণ গাছের পাতা খাওয়া শুরু করলেন। হযরত সাদ (রাঃ)-হাদীসের মধ্যে এ ঘটনারই উল্লেখ করেছেন। এ সেনাবাহিনী বলা হয় সরিয়তুল খবত। খবত শব্দের অর্থ গাছের পাতা ঝড়া। ধর্মের জন্য, সত্যের জন্য, ইসলামের জন্য আল্লাহর জন্য হযরত রাসূল (সাঃ)-এবং তাঁর সাহাবীগণ যে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটনের মধ্যে দিন কাটিয়ে যেভাবে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, ধৈর্যাবলম্বন করেছেন–তেমন আত্মোৎসর্গের পরিচয় অন্য কোন নবী ও তাঁর উম্মতের মধ্যে পাওয়া যায়না।

জাম-এ তিরমিযী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যায় হিযরতের পূর্বে একবার রাসূল (সাঃ) মক্কার বাইরে যান। ইসলাম প্রচারে ও তাবলীগের কাজ চিরতরে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কাফির-মুশরিকেরা সংঘবদ্ধভাবে তাঁর উপর

যেভাবে অত্যাচার-উৎপীড়ন করেছিল, যেভাবে তাঁকে ভীতি প্রদর্শন করেছিল, কষ্ট দিয়েছিল–তেমন আর কারও উপর করা হয়নি। অপরিসীম সহনশীলতা ও অতুলনীয় ধৈর্য ছিল বলেই এসব মারাত্মক হুমকি ও প্রাণ সংহারক নির্যাতন উপেক্ষা করে আপন কর্তব্যে অটল থাকা হযরত রাসূল (সাঃ)-এর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। এ জঘণ্যতম নিডীড়নের মুখে তাঁর পক্ষে মক্কা একেবারেই নিরাপদ ও অবস্থানযোগ্য ছিলনা বলেই আল্লাহ্‌র আদেশে তিনি মদীনায় হিযরত করেছিলেন, কিন্তু হিযরতের পূর্বে তিনি এক মাসের জন্য হযরত বিলাল (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে মক্কা ত্যাগ করে বাইরে যান। সে সময় অভাব-অনটন ও অনাহারে তাঁকে যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল তা বর্ণনা করা সত্যিই দুষ্কর।

রাসূল (সাঃ)-এর দাওয়াতে প্রভাবিত মদীনার প্রথম যুবক

এ সৌভাগ্যবান যুবকটি ছিলেন হযরত সোওয়াইদ (রাঃ) ইব্‌নে সালত মুহাম্মদ হুসাইন হাইকল মিসরী 'হায়াতে মুহাম্মদ' গ্রন্থে উদ্ধৃত বর্ণনা মোতাবেক ইসলামের প্রতি সোওয়াইদ (রাঃ) ইব্‌নে সালতের প্রভাবিত হওয়ার ঘটনা। তিনি ছিলেন ইয়াসরিব তথা মদীনার দূস সম্প্রদায়ের লোক। তিনি তাঁর সম্ভ্রান্ততা, জনপ্রিয়তা, কাব্যচর্চা ও সাহসিকতার জন্য নিজ সম্প্রদায়ে 'কামেল' পূর্ণাঙ্গ বা খেতাবে ভূষিত ছিলেন। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সময় একবার কা'বা যিয়ারতে মক্কা এলে রাসূল (সাঃ) তাঁকে যথারীত ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত জানান। সোওয়াইদ বলেন, হয় তো আপনার কাছে সে জিনিসই থাকবে, যা আমার কাছে পূর্ব থেকেই রয়েছে। রাসূল (সাঃ) জানতে চাইলেন, তা কোন্ জিনিস? সোওয়াইদ (রাঃ) বললেন, আমার কাছে লুকমান (আঃ)-এর বাণী রয়েছে। রাসূল (সাঃ)-এর তাঁর কিছু বাণী শুনে বললেন, "এতো ভাল কথা। কিন্তু আমার কাছে এর চাইতেও ভাল জিনিস রয়েছে, যা আল্লাহ্ তাআলা আমাকে মানুষের হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ করেছেন; তা অত্যন্ত নূরানী সে কালাম।"

একথা বলার পর রাসূল (সাঃ) কুরআন করীমের একটি আয়াত তিলাওয়াত করে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। সোওয়াইদের অন্তরে এক অভূতপূর্ব ভাবান্তর সৃষ্টি হল। তিনি নিবেদন করলেন, "এ বাণী তো অতি উত্তম বাণী।" তারপর তিনি যখন মদীনায় ফিরে এলেন, তারপর থেকে তাঁর চিন্তা-চেতনায়

কুরআন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তিনি যখন খাযরাজের হাতে নিহত হন, তখন তাঁর সম্প্রদায় বলল, "সোওয়াইদ মুসলমান হয়ে মরল।" ইনিই মদীনার প্রথম যুবক যিনি রাসূল (সাঃ)-এর দাওয়াত দ্বারা প্রভাবিত হয়।

ইসলামের জন্য উৎসর্গকারী প্রথম ব্যক্তি

এ গৌরবের অধিকারী ছিলেন হযরত হারেস ইব্‌নে আবী হালাহ্। তখন প্রকাশ্যে ইসলাম তবলীগ বা প্রচারের মাত্র কয়েকদিন অতিবাহিত হয়েছে। এরই মধ্যে একদিন উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদীযা (রাঃ)-এর প্রথম স্বামী আবু হালাহ্ ইব্‌নে যারারাহর ঔরসজাত পুত্র হারেস (রাঃ) যিনি রাসূল (সাঃ)-এর পোষ্য ছিলেন নিজের ঘরে বিশ্রাম করতে গিয়ে হঠাৎ করে কা'বা ঘরের দিক থেকে হৈ-হাল্লার শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি আঁতকে উঠে সে দিকে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে গেলেন। তখন ক'বা ঘরে তিনশ' ষাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। যে ঘরটি আল্লাহ্‌র খলীল হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে আল্লাহ্‌র ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করেছিলেন। তখন সেটি পরিণত হয়েছিল দেবালয়ে। অবস্থা এমনি শোচনীয় আকার ধারণ করেছিল যে, এর চার দেয়ালের ভেতর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করলে তার অবমাননা গণ্য করা হত। মূর্তির অস্তিত্বে এর অবমাননা হত না উলঙ্গ তাওয়াফে কিংবা শিস দিলে ও তালি বাজালে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে বলী দিলে কিংবা পুরোহিতদের ভাতা গ্রহণ বরং এ ঘরেরই প্রকৃত মালিকের নাম উচ্চারণে হত এর অবমাননা। এমনি ছিল সেদিনকার পরিস্থিতি।

এরি মধ্যে রাসূল (সাঃ) আসমান-যমিনের পালনকর্তা আল্লাহ্ পক্ষ থেকে নির্দেশ লাভ করেছিলেন, যেন তিনি প্রকাশ্যভাবে ইসলামের দাওয়াতের কাজ চালাতে থাকেন। এতে যেন কারো পারোয়া তিনি না করেন। তাই সেদিন তিনি কা'বা চত্বরে দাঁড়িয়ে বলিষ্ঠকণ্ঠে এ ঘরের মালিকের নাম ঘোষণা করে বললেন, তোমরা সবাই বল, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।"

তাওহীদ ও রিসালাতের এ ঘোষণা শোনার সাথে সাথে কা'বায় উপস্থিত দুরাত্মাদের অন্তরাত্মা জ্বলে উঠল। তারা সবাই চিৎকার কর উঠল, "অবমাননা; এটা কার অবমাননা; নির্ঘাত আমাদের দেব-দেবীর অবমাননা!" চারদিক থেকে একই চিৎকার ও হৈ চৈ। এরই মাঝে দাঁড়িয়ে আছে চিরসত্য, চিরবিশ্বস্ত মহানবী (সাঃ) যাঁকে সমগ্র মক্কায় তারাই একদিন সর্বাধিক সত্যবাদী এবং সর্বাধিক আমানতদার ও পবিত্রাত্মা বলে গণ্য করত। আজ পবিত্রতার দাওয়াত ও

অন্যায়ের পার্থক্যের কথা বলার কারণে তাঁকেই আজ চারদিক থেকে অবরুদ্ধ করে ফেলা হয়েছে। তিনি সে রক্তলিপ্সু পিশচদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রতি মুহূর্তে তাঁর প্রাণাশঙ্কা। এমনি সময় হযরত হারেস (রাঃ) ইব্‌নে হালাহ্ সেখানে এসে ভীড় ভেদ করে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এসে উপনীত হন। সাথে সাথে কাফেরদর উদ্ধৃত তলোয়ার তাঁর উপর চারদিক থেকে আঘাত হানতে শুরু করে। আর তিনি সত্যের পথে নিজের প্রাণের নজরানা পেশ করে চিরদিনের জন্য নীরব হয়ে যান। এ ছিল হারেস (রাঃ) ইব্‌নে হালাহ্'র প্রাণ যা সর্বপ্রথম সত্যের সমর্থনে উৎসর্গিত হয়। মুসলমানদের মাঝে সর্বপ্রথম শাহাদতের মুকুট তাঁরই মস্তকের শোভা বর্ধন করে।

ইসলাম প্রচারে প্রথম যিনি তলোয়ার পরিচালনা করেন

যিনি ইসলাম প্রচারে সর্বপ্রথম তলোয়ার চালানোর এ গৌরব অর্জন করেছিলেন তিনি হলেন, হযরত যুবাইর ইব্‌নে আওয়াম। রাসূল (সাঃ) নবুওয়ত লাভের প্রাথমিক পর্যায়ে এক সন্ধ্যায় আবু তালেবের বাড়ীতে বনু হাশেম ও বনী আবুদল মুত্তালিব সমবেত হয়। অবশ্য তখন আবু জাহল উপস্থিত ছিল না। এটি ছিল তাদের পারিবারিক বৈঠক। উদ্দেশ্য ছিল রাসূল (সাঃ) সমর্থনে গোত্রীয় আত্মসম্মানবোধকে কাজে লাগানোর বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা। বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, রাসূল (সাঃ)-কে সমর্থন করতে হবে এবং পারিবারিক মান-মর্যাদা রক্ষার স্বার্থেই শক্রর মোকাবেলায় তাঁকে সাহায্যও করতে হবে। এতে আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ভোরে নিজেদের এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে রাসূল (সাঃ)-কে অবহিত করতে হবে। পরের দিন এঁরা সবাই রাসূল (সাঃ)-এর বাড়ীতে হাযির হয়ে জানতে পারে, তিনি বাড়ীতে নেই। সবার মাথা ঘুরে যায়। তখন তাঁরা তাঁর সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। এ দিকে গুজব রটে যায়, মুহাম্মদ রাসূল (সাঃ)-কে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। একথা শুনতেই তাঁদের সবার বুকে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠে। তাঁরা সবাই নিজ নিজ বাড়ী গিয়ে তীক্ষ্ম, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে সেগুলো লুকিয়ে রেখে আবু তালেবের সাথে রাসূল (সাঃ)-এর অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। পথে যায়েদ ইব্‌নে হারেসা (রাঃ)-এর সাথে দেখা হলে জানতে পারে, তিনি ততক্ষণে বাড়ীতে তশরীফ এনেছেন। তখন তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রাসূল (সাঃ)-এর বাড়ীর দিকে রওয়ানা হয়ে যায়।

রাসূল (সাঃ)-এর শাহাদাতের গুজব শোনামাত্র বনু আসাদের ষোল বছর বয়সের যুবক ইবনুল আওয়াম তলোয়ার নিয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে বিরিয়ে

পড়েন এবং রাসূল (সাঃ)-এর বাড়ীর দিকে বিষয়টির যথার্থতা যাচাই করে নেয়ার জন্যে ছুটে যান। যদি দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে, তাহলে এ তলোয়ারেই হত্যাকারীদেরকে জাহান্নামে পাঠাবেন এ ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু রাসূল (সাঃ)-কে বাড়ীতে দেখতে পেয়ে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। রাসূল (সাঃ) তাঁকে দেখে হেসে বলেন, "কি হে ভাই, এ সময়ে তুমি তলোয়ার নিয়ে, কি ব্যাপার?" হযরত যুবাইর নিবেদন করলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ্, (সাঃ) আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কুরবান, আমি শুনেছিলাম, আপনাকে শক্ররা আটক কিংবা শহীদ করে দিয়েছে। তাই আমি তলোয়ার তুলে নিয়েছি। রাসূল (সাঃ) বললেন, "ঘটনাটি যদি সত্য হত, তাহলে তুমি কি করতে? তিনি বললেন," ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আল্লাহ্‌র কসম, তাহলে আমি মক্কাবাসীর সাথে লড়াই করে করে মরে যেতাম।" উত্তর শুনে রাসূল (সাঃ) অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করলেন। তাঁর সে তলোয়ারের জন্যেও দোয়া করলেন।

এটা ছিল প্রথম তলোয়ার, যা সত্যের পথে ও রাসূল (সাঃ)-এর সমর্থনে উত্থিত হয়। আর হযরত যুবাইর (রাঃ) ইব্‌নে আওয়াম ছিলেন সে তলোয়ার উত্তোলনকারী। হযরত যুবাইর রাসূল (সাঃ)এর হাওয়ারী তথা অনুচর খেতাবে খ্যাত হন। তিনি রাসূল (সাঃ) ফুফু হযরত সফিয়্যাহ (রাঃ) এর পুত্র ছিলেন এবং উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বড় বোন হযরত আসমা (রাঃ)-এর স্বামী। এভাবে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর ভায়রা ভাইও ছিলেন বটে। শৈশবেই তাঁর পিতা মারা যান। তিনি ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ভুক্ত ছিলেন। গযওয়ায়ে বদর উপলক্ষ্যে তিনি অসাধারণ সাহস ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি বর্শার আঘাতে আবু যাত আলকর্শ নামক কাফরকে হত্যা করেন। বর্শাটি তার চোখে বিদ্ধ হয়েছিল। তিনি সেটি পায়ের জোরে বের করতে গেলে সেটি বাঁকা হয়ে যায়। রাসূল (সাঃ) সেটি তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নেন এবং সারাজীবন নিজের কাছে সংরক্ষিত রাখেন। তার পরে সেটি একের পর এক খোলাফায়ে রাশেদীনের কাছে সংরক্ষিত হতে থাকে। পরে সেটি তাঁর পুত্র হযরত আবুদল্লাহ্ (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ)-এর পরিবারের কাছ থেকে সংগ্রহ করে সারাজীবন নিজের কাছে রাখেন। গযওয়ায়ে ওহুদে তিনিও সে চৌদ্দজন সাহাবীর মধ্যে ছিলেন যাঁরা শেষ পর্যন্ত দৃঢ়পদ থাকেন। সেদিন তিনি মুশরিকদের পতাকাবাহী তালহা ইব্‌নে আবী তালহাকে হত্যা করেন। রাসূল (সাঃ)-এর সাথে প্রায় সমস্ত অভিযানেই তিনি শরীক ছিলেন।

আহযাব যুদ্ধকালে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশানুযায়ী বনী কোরাইযার বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তৎপরতা চালিয়ে তাদের সঠিক অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে রাসূল (সাঃ)-কে অবহিত করেন। তাতে খুশী হয়ে রাসূল (সাঃ) বলেন, "সমস্ত নবীরই একজন অনুচর থাকত, আর যুবাইর হল আমার অনুচর। আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত।" রাসূল (সাঃ)-এর মুখ থেকে এ কথাটি শুধুমাত্র সাদ ইব্‌নে আবী ওক্কাসের জন্য গযওয়ায়ে ওহুদের সময় আর হযরত যুবাইর এর জন্য গযওয়ায়ে আহযাবের সময় উচ্চারিত হয়েছিল। তিনি হিযরত করে মদীনায় চলে যান। এদিকে উম্মে সালমা (রাঃ) প্রতিদিন আবতাহ নামক এক টিলায় বসে বসে কান্নাকাটি করতে থাকেন। পরে বনু মুগীরার জনৈক সহৃদয় ব্যক্তির মাধ্যমে এ বিষয়টি নিষ্পত্তি হয় এবং হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) তাঁর শিশু সন্তানসহ মদীনায় হিযরত করেন। এটা ছিল তাঁদের তৃতীয় হিযরত।

হযরত আবু সালামা ২য় হিজরীতে গযওয়ায়ে বদর এবং ২য় হিজরীতে ওহুদ যুদ্ধে শরীক হন। সেখানে এক কাফেরের বিষমিশ্রিত তীরের আঘাতে তাঁর যখম হয়। যদিও তিনি একসময় সুস্থ হয়ে উঠেন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে বিষ তাঁর কাজ করতেই থাকে। ৩য় হিজরীর শেষ ভাগে রাসূল (সাঃ) তাঁকে একশ পঁচিশজনের অশ্বারোহী বাহিনীসহ বনু আসাদ ইবনে খোযাইমায় পাঠান। ৪র্থ হিজরীর ১লা মহররম তিনি অত্যন্ত গোপনে তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে বিজয় অর্জন করেন। এ অভিযানটি সারিয়্যাহ আবু সালামা অথবা সারিয়্যাহ কোতন নামে খ্যাত। তাঁর বীরত্ব ও কৃতিত্বের জন্য অত্যন্ত খুশী হয়ে রাসূল (সাঃ) তাঁকে দোয়া করেন। এ অভিযনে তাঁর পূর্বেকার যখম পুনরায় চাড়া দিয়ে উঠে এবং বহু চিকিৎসা সত্ত্বেও তা আর সুস্থ হয়নি। এরই দরুন তিনি ৪র্থ হিজরীর শুরুতে কঠিনভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাসূল (সাঃ) এ খবর জানতে পেরে তাঁর বাড়ীতে তশরীফ নিয়ে যান। তখন তাঁর চোখ বন্দ করে দেন এবং বলেন, "মানুষের আত্মা যখন তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন তার চোখ সেটিকে দেখার জন্য খোলা থেকে যায়।" তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে সালাামা (রাঃ)-কে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়ে বলেন, তাঁর মাগফিরাতের জন্য দোয়া কর এবং বল, "আয় আল্লাহ্‌ আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম স্থলাভিষিক্ত দান করুন।" আল্লাহ্‌ তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং কয়েক মাস পর স্বয়ং রাসূল (সাঃ) তাঁকে বিয়ে করে নেন। তাঁর সন্তানও রাসূল (সাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে চয়ে আসে।

হযরত আবু সালামা (রাঃ) রাসূল প্রেম, নিষ্ঠা ও বীরত্বে অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকার ছিলেন।

প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মহাপুরুষ

সর্বপ্রথম মহিলাদের মধ্যে ঈমান গ্রহণের গৌরব অর্জন করেছিলেন হযরত খাদীজা (রাঃ), তেমনি সচেতন পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলামের দাওয়াত কবুল করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)।

রাসূল (সাঃ) বলেন, "আমি যাকেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি, তার মনেই প্রথম কিছু না কিছু দ্বিধা-দ্বন্ধ সৃষ্টি হয়েছে, একমাত্র আবু বকর ব্যতীত। আমি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া মাত্র তিনি বিনা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সাথে সাথে তা কবুল করেন। এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (সাঃ) যখন হেরা গুহায় ফেরশতার আগমন এবং ওহী নাযিলের ঘটনা হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে শোনান, তখন তিনি সামান্যতম সন্দেহ-সংশয়ও প্রকাশ করেননি; নিঃসংঙ্কোচে তাঁর যাবতীয় কথা বিশ্বাস করে নেন। নির্দ্ধিধায় এভাবে ইসলাম কবুল করে নেয়ার পিছনে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে হযরত আবু বকর (রাঃ) -এর বন্ধুত্বের একটা হাত ছিল যার ফলে রাসূল (সাঃ)-কে অত্যন্ত কাছে থেকে দেখার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল। রাসূল (সাঃ)-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু আবু কোহাফা তনয় আবু বকর ছিলেন অত্যন্ত বিজ্ঞতাসম্পন্ন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তখন তাঁর বয়স আটত্রিশ বছর। তাঁর সুদৃঢ় অনুভূতি ও মানসিক যোগ্যতা সম্পর্কে সবাই ছিল দ্বিধাহীন। তিনি তাঁর বন্ধু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মুখে তওহীদ ও রিসালাতের বাণী শোনা মাত্র নির্দ্বিধায় প্রসন্নচিত্তে তা গ্রহণ করে নেন। কারণ, তিনি তখন পর্যন্ত তাঁর এ বন্ধুর যবান থেকে কোন মিথ্যা কথা শুনেননি। রাসূল (সাঃ)-এর জীবন তাঁর সামনে ছিল এক সু-উজ্জ্বল উন্মুক্ত পুস্তকের ন্যায়। তার ইসলাম গ্রহণ করে নেয়াটা ছিল এর প্রশান যে, এ পুস্তকের কোথাও কোন কলঙ্ক, কোন ত্রুটি কিংবা কোন সন্দেহ নেই। বরং এর প্রতিটি ছত্র হৃদয়গ্রাহী, প্রতিটি বর্ণ চিত্তাকর্ষক, প্রতিটি পাতা বিমোহিত এবং প্রতিটি কথা আলোকময়।

হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিলেন অতি উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও কোমলমতি। বুদ্ধি-বিবেচনা, দূরদর্শিতা ও চিন্তা-চেতনার বলিষ্ঠতার দিক দিয়ে সমগ্র মক্কায় অতি অল্প লোকই তাঁর সমকক্ষ ছিল। নিজ সম্প্রদায়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়, বংশবিদ্যায় তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ; মক্কার কোরায়েশদের সমস্ত গোত্রের ইতিহাস বংশ পরম্পরা তাঁর নখদর্পনে ছিল। তিনি সমস্ত গোত্র-গোষ্ঠীর দোষ-ত্রুটি ও গুণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। এ বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে সারা কোরায়েশের কেহ তাঁর মোকাবেলা করতে পারত না। তিনি

একজন শিষ্ট, মিশুক ও সৎ ব্যবসায়ী ছিলেন। সম্প্রদায়ের সমস্ত লোক তাঁর উত্তম চরিত্র ও সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ ছিল। আর তাঁর এসব বৈশিষ্ট্যের দরুন সবাই তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসত। হযরত অবু বকর (রাঃ) ছিলেন তামীম গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত। ৫৭৩ ঈসায়ীতে তাঁর জন্ম হয়। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর চাইতে মাত্র আড়াই বছরের ছোট ছিলেন। শৈশব থেকে লেখাপড়া শিখেছিলেন। সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করে তিনি তা নিজের বন্ধু-বান্ধবের কাছেও পৌঁছাতে শুরু করেন। এ ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট গোপনীয়তা রক্ষা করতে থাকেন এবং দৃঢ়তা ও প্রত্যয়ের সাথে কাজ চালিয়ে যান। সুতরাং তাঁর প্রচেষ্টায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ যথাক্রমে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওক্কাস (রাঃ), হযরত ওসমান ইব্‌নে আফফান (রাঃ), হযরত উবাইদ ইব্‌নে যায়েদ (রাঃ), হযরত তালহা ইব্‌নে উবাইদুল্লাহ্ (রাঃ), হযরত যুবাইর (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান (রাঃ), হযরত ওসমান ইব্‌নে মাযউন (রাঃ), হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাঃ), হযরত খালেদ ইব্‌নে সাঈদ (রাঃ), হযরত আবু সালামা (রাঃ)। তাঁর মাতা হযরত উম্মুল খায়ের (রাঃ) তাঁর আন্দোলনের শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পিতা আবু কোহাফাহ্ (রাঃ), ইসলাম গ্রহণ করেন মক্কা বিজয়ের পর। হযরত আবু বকর (রাঃ) বহু ক্রীতদাসকে খরিদ করে নিয়ে মুক্ত করে দেন। তিনি হযরত বেলাল (রাঃ)-কেও তার মালিক উমাইয়্যার কাছ থেকে খরিদ করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। মক্কার কঠিন ও বিপদসঙ্কুল জীবনে তিনি মহানবী (সাঃ)-কে সর্বত্র ও সর্ব অবস্থায় এমনভাবে সঙ্গদান করেন যে, ইতিহাস পর্যন্ত তার দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়ে যায়। মদীনায় হিজরত কালে তিনিই রাসূল (সাঃ)-এর সাথে থেকে সমুদয় কাজ তিনিই সম্পন্ন করেছিলেন।

তাঁর আদরের দুলালী হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র সহধর্মিনী। হযরত আবু বকর (রাঃ) সমস্ত জিহাদে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে থেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। হিজরী সনে মুসলমানগণ প্রথম যে হজ্ব পালন করেন তিনিই ছিলেন তার আমীর। তিনশ' সাহাবীর কাফেলা তাঁরই নেতৃত্ব ছিল। রাসূল (সাঃ) নিজের অসুস্থতার সময় তাঁকেই নিজের স্থলাভিষিক্ত ইমাম নিযুক্ত করেন। কাজেই তিনি ১ হিজরী ১৮ কিংবা কোন কোন বর্ণনায় অনুযায়ী ১৯শে সফর জুমাবার রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশক্রমে তাঁর

মুসাল্লায় দাঁড়িয়ে মুসলমানদেরকে ঈশার নামায পড়ান এবং অতঃপর জুমাবার রাত থেকে সোমবার ফযর পর্যন্ত নামাযের ইমামতি করেন। রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের দরুন মুসলমানদের মাঝে আতঙ্ক ও হতাশা ছড়িয়ে পড়লে তিনিই সমাবেশের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন–"হ্যাঁ, তোমাদের মধ্যে যাঁরা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারী, তাঁদের জেনে রাখা উচিত যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু যাঁরা আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁরই বন্দেগী করে তাঁদের জানান উচিত, আল্লাহ্ জীবিত এবং তাঁর কখনও মৃত্যু নেই। আল্লাহ্ নিজেই তাঁর নবীকে বলেছেন, তোমার মৃত্যু হবে এবং অন্যান্যদেরও।" "রাসূল (সাঃ) একজন নবী ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে আরো নবীর আসা যাওয়া হয়েছে। কাজেই তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন কিংবা শহীদ হয়ে যান, তবে কি তোমরা ফিরে চলে যাবে? মনে রেখ, যে ব্যক্তি ইসলাম পরিহার করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, সে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অবশ্য যাঁরা সর্বাস্থায় আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন, তিনি তাঁদেরকে প্রতিদান দেবেন।" তাঁর এ অন্তর্ভেদী ভাষণ শুনে সাহাবায়ে কিরামের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যায়। কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের শ্বাষরুদ্ধ হয়ে এল। স্বয়ং হযরত ওমর (রাঃ)-এর অবস্থাও তাই হল। তিনি ধারাশায়ী হয়ে পড়লেন।

রাসূল (সাঃ) ওফাতের পর তিনি সাকীফায়ে বনু সায়েদার, নিতান্ত বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম হলেন। তাতে করে খিলাফতের সমস্যা চিরতরে সমাধান হয়ে যায়। লোকেরা তাঁকেই সর্বপ্রথম খলীফা নিযুক্ত করলেন। খিলাফত গ্রহণ করার পর তিনি যে বিজ্ঞোচিত ভাষণ দান করেছিলেন তার কিছু উদ্ধৃতি স্মরণযোগ্য।

"বন্ধুগণ! আমি তোমাদের উপর শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছি। অথচ আমি তোমাদের চেয়ে উত্তম নই।

আমি যদি ভাল কাজ করি, তাহলে তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। আর যদি দেখ, মন্দের দিকে যাচ্ছি, তাহলে আমাকে সোজা করে দিবে।

হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে যে দুর্বল সে আমার কাছে সবল। ইনশাআল্লাহ্ আমি তার অধিকার পাইয়ে দেব।

যদি আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দেখানো পথে চলি, তবে তোমরা আমার আনুগত্য কর।

কিন্তু যদি আমি আল্লাহ্ ও রাসূলের পথ ছেড়ে দিই, তাহলে তোমাদের কারো উপরই আমার হুকুম চলতে পারে না।"

তাঁরই প্রয়াসে কুরআন মজীদ লিপিবদ্ধ হয়ে একটি গ্রন্থকারে সংকলিত হয়। যে গৌরব অন্য কোন সাহাবীর অর্জিত হয়নি।

তাঁর খেলাফত কাল ছিল ২রা রবিউল আউয়াল ১১ হিজরী থেকে ২৪শে জমাদিউল আউয়ালাল ১৩ হিজরী পর্যন্ত। দু'বছর তিন মাস বাইশ দিন।

খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার সাথে সাতেই তাঁকে নানান জটিল ও ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। তার কয়েকটি নিম্নরূপঃ

(১) বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামের মতপার্থক্য সত্ত্বেও রোম সম্রাট কায়সারের বিরুদ্ধে হযরত ওসামা (রাঃ) এর নেতৃত্বে সৈন্য সমাবেশ।

(২) নবুওয়তের মিথ্যা দাবীদার মুসাইলামাতুল কাযযাবের বিপুল শক্তি সঞ্চয়।

(৩) ইয়ামেন ও নাজদ অঞ্চলে যাকাত বিরোধী তৎপরতা।

(৪) মুর্তাদদের ভয়াবহ তৎপরতা প্রভৃতি।

কিন্তু তিনি তাঁর দৃঢ়তা, বুদ্ধিমত্তা, সৎসাহস ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে এ সমুদয় সমস্যা একে একে সমাধান করে নিতে সক্ষম হন এবং যখন তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন, তখন সব সমস্যাই শেষ হয়েছিল। তাঁর জীবনের অন্তিম দিনগুলোতে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল এবং রোমানদের সাথেও তুমুল যুদ্ধ চলছিল। তিনি এসব যুদ্ধ-বিগ্রহ, মুর্তাদ সমস্যা এবং মিথ্যা নবীদের মোকাবেলার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত সেনাপতি ও সর্দারদেরকে নির্বাচিত করে নিজের বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর নির্বাচিত সেনাপতিগণ ছিলেন, হযরত কা'ব ইবনে আমর (রাঃ), হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ), হযরত আ'লা ইবনে হাযরামী (রাঃ), হযরত মুহাজির ইবনে আবি উমাইয়া, হযরত ইকরিমা (রাঃ), হযরত হুযাইফা (রাঃ), ইবনে মুহসিন দামীরী। তিনি তাঁর অসুস্থতা যখন অনুভব করলেন তখন আল্লাহ্র দরবারে যাবার সময় হয়ে যায়, তখন নিজেই হযরত ওমর (রাঃ)-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে যথারীতি তা ঘোষণা করে দিলেন যাতে তাঁর পরে মুসলমানরা কোন রকম বিভেদ-বিভ্রান্তির শিকার না হয়। তিনি মুসলমানদেরকে বহু উপদেশও দান করলেন। তিনি ২৪ শে জমাদিউল আখের ১৩ হিজরী মোতাবেক ২২শে আগষ্ট ৬৩৪ ঈসায়ী সোমাবার সন্ধায় ইহ্জগত ত্যাগ করেন। তখন বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তাঁর নামাযে জানাযা পড়ান হযরত ওমর (রাঃ)। আর তাঁর লাশ কবরে নামিয়েছিলেন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), ও হযরত তালহা (রাঃ)। হযরত আয়েশা

(রাঃ)-এর ঘরে রাসূল (সাঃ)-এর কবরে পূর্ব পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর সম্পর্কে (সাঃ) বলেছিলেন, "অমি সবার ইহসানের দায়ই শোধ করে দিয়েছি, কিন্তু আবু বকরের ইহসানের বদলা স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামতের দিন দেবেন।" তিনি আশরা-মুবাশশারার অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। বলাবাহুল্য, তিনি ছিলেন নবীগণের পর সর্বোত্তম মানুষ।

প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী যুবক

যুবকদের সর্ব প্রথম ঈমান আনার গৌরব অর্জন করেছিলেন হযরত আলী (রাঃ)। অল্প বয়সেই তিনি ইসলামের দাওয়াত কবুল করেছিলেন। তখন তিনি রাসূল (সাঃ)-এর তত্ত্বধানে ছিলেন। তাঁর পরিচর্যার কল্যাণে ইতিমধ্যেই তাঁর ব্যক্তি সত্ত্বা বিকশিত হয়েছিল। তাই ন্যায় ও সত্যের বাণী শোনা মাত্রই তিনি তা মনে প্রাণে গ্রহণ করেন এবং সমগ্র জীবন এ পথে আত্মোৎসর্গের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে থাকেন। তাঁর পিতার নাম আবদে মানাফ যিনি নিজের কনিয়াত তথা উপনাম আবু তালেব ডাক নামে খ্যাত ছিলেন এবং রাসূল (সাঃ)-এর আপন চাচা ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল ফাতেমা বিন্তে আসাদ যিনি রাসূল (সাঃ)-এর লাল-পালনে প্রকৃষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর পিতা আবু তালেব, রাসূল (সাঃ)-এর পিতা আবুদল্লাহ্ ও যুবাইর এ তিনজন ছিলেন সহোদর ভাই। অন্যান্যরা ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের অন্যান্য স্ত্রীর সন্তান। হযরত আলী (রাঃ) বনু হাশেমের দাওয়াতের সময় রাসূল (সাঃ)-এর সাথে থাকার কথা ঘোষণা করেছিলেন অথচ তখনো তিনি ছিলেন কিশোর।

যেসব বর্ণনা মোতাবেক রাসূল (সাঃ) মক্কা থেকে মদীনা অভিমুখে রাতের অন্ধকারে হিজরত করার বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোতে বলা হয়েছে, রাসূল (সাঃ) হযরত আলীকে নিজের বিছানায় শুইয়ে রেখে গিয়েছিলেন। তা করা হয়েছিল যাতে তাঁর কাছে রক্ষিত মানুষের আমানত সমূহ প্রত্যর্পণ করে মদীনায় হিজরত করেন। হযরত আলী (রাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় সংঘটিত প্রায় সমস্ত যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করে বিস্ময়ক ভূমিকা পালন করেন। তিনি বীরত্ব ও সাহসিকতার এমন অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, যা আজো উদাহরণ হয়ে আছে। বদর যুদ্ধে তিনি তাঁর প্রতিপক্ষ শায়বাকে একই আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত করেন। রাসূল (সাঃ)-এর নিজ কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ)-কে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। এতে করে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর অধিকতর ঘনিষ্ঠ হয়ে যান। খন্দক যুদ্ধে তিনি

একাই কাফেরদের হাজার সেনার সমকক্ষ আমর ইবনে আবদে বুদকে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে হত্যা করেছিলেন। হুদায়বিয়া নামক স্থানে বাইয়াতে রিদওয়ানের চুক্তিপত্র তিনিই লিখেছিলেন। কোন কোন বর্ণনানুযায়ী খায়বর যুদ্ধে বিখ্যাত ইহুদী বীর মারহাবকে তিনিই হত্যা করেছিলেন। অবশ্য অন্যান্য ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, মারহাবের হত্যাকারী ছিলেন মুহাম্মদ ইব্‌নে সালামা (রাঃ)। গযওয়ায়ে হুনাইন ও মক্কা বিজয়ের ক্ষেত্রেও তিনি বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। ৯ম হিজরী সালে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নেতৃত্বে পালিত হজ্বের সময় তিনি রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশক্রমে সূরা তওবার ১ম থেকে ৩৭ তম আয়াত পাঠ করে লোকদেরকে শোনান। তাতে ছিল মুক্তির ঘোষণা এবং কাফেরদেরকে হজ্ব সম্পাদনের অনুমতি দানের অস্বীকৃতি।

হযরত আনাস ইব্‌নে নযরের শাহাদত

তিনি রাসূল (সাঃ)-এর একজন সাহাবী হওয়া সত্বেও বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারেন নাই। তাঁর এজন্য দুঃখ ছিল, তাই তিনি নিজেকে গাল মন্দ করে বলতেন, এটাই ছিল ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, আর তুমি তাতেই অংশ গ্রহণ করতে পারলেনা। আর এ আশাও পোষণ করতেন যে, আবার কোন যুদ্ধে সুযোগ পেলে মনের এ বাসনা পূর্ণ করবেন। এজন্য বেশী দিন অপেক্ষা করতে হল না অল্পদিন পরেই উহুদ যুদ্ধের দামামা বেঁজে উঠল, যাতে তিনি অত্যন্ত সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। উহুদ যুদ্ধে প্রথম দিকে মুসলমানদের বিজয় লাভ হল। কিন্তু শেষে একটি ভুলের কারণে তাঁদের সাময়িক পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। ভুলটি ছিল এরূপ, রাসূল (সাঃ) কিছু সাহাবীকে একটি বিশেষ জায়গায় পাহারা দেয়ার জন্য মোতায়ন করে বললেন, যতক্ষণ আমি না বলি কেহ স্বীয় স্থান ছেড়ে যাবে না। কেননা সেদিক থেকে দুশমনদের আক্রমণের ভয় ছিল। যখন প্রথম দিকে মুসলমানদের বিজয় হল এবং কাফিরগণ পলায়নরত, তখন সাহাবী সৈনিকগণ এ ভেবে তাঁরা স্বীয় স্থান ত্যাগ করলেন যে, যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেছে। তাই কাফিরদের ধাওয়া করা ও গনিমতের মাল জমা করা এখন একান্তই দরকার। এ অবস্থায় তাঁদের দলনেতা স্থান ত্যাগ করতে এ বলে নিষেধ করলেন যে, রাসূল (সাঃ) তোমাদেরকে এ ঘাঁটি ছেড়ে যেতে নিষেধ করেছেন, তাই তোমরা এখানেই স্থির থাক। কিন্তু তাঁরা ভাবল যে, হযরতের আদেশ শুধুমাত্র যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের জন্যই ছিল, তাই সেখানে থেকে তাঁরা যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। পলায়নরত কাফিরগণ এ সংরক্ষিত ঘাঁটিটি খালি দেখে

হঠাৎ হামলা করল। তখন মুসলমানগণ যেহেতু অপ্রস্তুত ছিলেন, এদিক থেকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তাই তাঁদের সাময়িক পরাজয় গ্রহণ করতে হল। তারা উভয় দিকের কাফিরদের মাঝে পড়ে দিশেহারা হয়ে দিক-বিদিক ছুটতে লাগলেন।

হযরত আনাস (রাঃ) দেখলেন, হযরত সায়াদ ইব্‌নে মুয়ায আসছেন। তিনি তাঁকে বললেন, 'হে সায়াদ কোথায় যাচ্ছ? আল্লাহ্‌র কসম! উহুদ পাহাড় থেকে জান্নাতের খুশবু আসছে।' এ বলেই তলোয়ার হাতে নিয়ে কাফিরদের মধ্যে প্রবেশ করে বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করলেন। শাহাদাতের পর দেখা গেল, শরীরখানা যেন চালনীর মত হয়ে গেছে। শরীরে আশি থেকেও বেশী তীর-তলোয়ারের আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। তাঁর বোন লাশ সনাক্ত করেন তাঁর আঙ্গুল দেখে।

হুদায়বিয়ার সন্ধি ও হযরত আবু জানদালের ভূমিকা

ষষ্ঠ হিজরীতে রাসূল (সাঃ) মক্কায় হজ্ব করতে সংকল্প করেছিলেন। মক্কার কাফেররা এ সংবাদ অবগত হয়ে তাঁকে বাধা দিতে কৃতসংকল্প হল। হযরত রাসূল (সাঃ) তাই মক্কায় প্রবেশ না করে তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে হুদায়বিয়া নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করলেন। রাসূল (সাঃ)-এর জন্যে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে সাহাবীদের সবাই প্রস্তুত ছিলেন। ফলে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তাঁরা কাফেরদের মোকাবেলা করতে তৈরী হলেন। কিন্তু রাসূল (সাঃ) মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধের আদেশ না দিয়ে সন্ধি স্থাপনের প্রচেষ্টা করলেন। যুদ্ধের জন্যে সাহাবীদের আন্তরিক ইচ্ছা এবং তাঁদের বীরত্বব্যঞ্জক আকুলতা থাকা সত্ত্বেও তিনি আপাতদৃষ্টিতে অবমানকর ও ক্ষতিকর মক্কাবাসীদের সন্ধির সমুদয় শর্ত মেনে নেন। সাহাবীদের সকল প্রকার আবেদন-নিবেদন ও তাঁদের মতামত উপেক্ষা করে সন্ধি শর্তে আবদ্ধ হওয়া অনেকের কাছে অসমীচীন বলে মনে হলেও রাসূল (সাঃ)-এর মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সকলেই নীরব রইলেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধির একটি শর্ত ছিল এরকমঃ কাফেরদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় গেলে তাঁকে মক্কায় ফেরত পাঠাতে হবে। অন্যদিকে মদীনার কোন মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করে মক্কায় চলে গেলে তাকে আর মদীনায় ফেরত পাঠান হবেনা। তখনও সন্ধিপত্র লেখা সম্পূর্ণ হয়নি মাত্র আলোচনা করে শর্তাদি ঠিক করা হয়েছিল। এমনি সময়ে আবু জান্দাল নামক এক সাহাবী হাত-পা শৃঙ্খলিত অবস্থায় অতিকষ্টে মুসলমানদের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে

বলেন, 'মুসলমান হওয়ার কারণে তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁকে নানাভাবে নির্যাতন করে।' অত্যাচার সহ্য করে তিনি এ ভেবে বাড়ি থেকে পলায়ন করেন যে, মুসলমানদের সাহায্যে তিনি নির্মম যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি লাভ করবেন। তাঁর পিতা সুহাইল। হুদায়বিয়ার সন্ধি সংক্রান্ত ব্যাপারে কাফিরদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। সে এসে স্বীয় পুত্র আবু জান্দালকে চপেটাঘাত করে তাকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে দাবী জানায়। রাসূল (সাঃ) বললেন, সন্ধিপত্রটি তো এখনও পাকাপাকি হয়নি। কাজেই এর শর্তাদি পালন করার তো এখন কোন প্রশ্ন উঠেনা।

কিন্তু সুহাইল তার দাবী ছাড়তে রাজী হল না। রাসূল (সাঃ) আবু জান্দালকে তার নিকট ভিক্ষা চাইলেন। তবু সুহাইলের মনে এতটুকু করুণার উদ্রেক হল না। তিনি করুণভাবে চিৎকার করে সাহাবীদেরকে বললেন, আমি মুসলমানদের হয়ে আপনাদের কাছে আশ্রয়ের জন্যে এসেছিলাম কিন্তু আপনারা আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। আমাকে যে এর কত যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, তা আপনারা কিছুই জানেন না। তাঁর আকুল আবেদন মুসলমানদের হৃদয়ে ব্যথা ও করুণা হল। কিন্তু তাঁরা তাঁকে কোন সাহায্যই করতে পারলেন না। রাসূল (সাঃ)-এর আদেশানুসারে তাঁকে অবশেষে বাড়ি ফিরে যেতে হল। বিদায়ের সময় রাসূল (সাঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আবু জান্দাল! ধৈর্যধারণ কর; অতি তাড়াতাড়িই আল্লাহ্ তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। সন্ধিপত্র লেখা শেষ হল।

আবু বাসীর (রাঃ) নামক একজন সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরত করলে কাফেররা তাঁকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে দু'জন লোককে প্রেরণ করে। সন্ধির শর্ত মোতাবেক রাসূল (সাঃ) তাঁর প্রতি সান্ত্বনার বাণী প্রদান করে বললেন, হে আবু বাসীর! ধৈর্য অবলম্বন কর। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন খুব দ্রুতই তোমার মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে দেবেন। আবু বাসীর (রাঃ) দু'জন কাফেরের সাথে রওয়ানা হলেন। পথে এক জায়গায় তিনি তাঁর সঙ্গীদের একজনকে বললেন, বন্ধু, তোমার তলোয়ারটি তো খুবই সুন্দর। বীর যোদ্ধা নিজের তরবারীর প্রশংসা শুনে পরিস্থিতির কথা ভুলে খাপ খুলে তা বের করে বলল, হ্যাঁ, এটি খুবই ভাল তলোয়ার। অনেকের উপরই আমি এর পরীক্ষা করেছি। এ কথা বলে সে তলোয়ারটি আবু বাসীদেরর হাতে অর্পণ করল। আবু বাসীর (রাঃ) তরবারী হাতে পেয়ে প্রথমেই মালিকের উপর তার ধার পরীক্ষা করলেন। তলোয়ারের এক আঘাতেই তরবারীর মালিক ইহলীলা সংবরণ করল।

আবু বাসীর (রাঃ)-এর দ্বিতীয় সাথী তার সঙ্গীর দুরাবস্থা দেখে মনে করল যে এবার তার পালা এসেছে। কাজেই সেখান থেকে যে দৌড়ে পালাল এবং হযরত রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এসে বলল, আবু বাসীর আমার সঙ্গীকে হত্যা করেছে এখন সে আমাকেও হত্যা করবে। তার কথা শেষ হতে না হতেই আবু বাসীর (রাঃ) সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে রাসূল (সাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আপনার ওয়াদা পূর্ণ করে আমাকে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। এখন আমার সম্বন্ধে তাদের কাছে পালন করবার মত আপনার কোন প্রতিশ্রুতি অবশিষ্ট নেই। সে আমাকে আমার ধর্ম হতে বিতাড়িত করতে চায়, তাই আমি তাকে হত্যা করেছি। তাঁর কথা শুনে রাসূল (সাঃ) বললেন, যুদ্ধ বাঁধানোর ইচ্ছা আছে? এ কথা শুনে আবু বাসীর বুঝলেন যে এখনও যদি তাঁকে ফেরত নেয়ার জন্য মক্কা থেকে কোন লোক আসে তাহলে তাঁকে নিশ্চয়ই ফিরে যেতে হবে। তাই তিনি মদীনা পরিত্যাগ করে সমুদ্রের উপকূলে হাঁটতে হাঁটতে এক জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এ সংবাদ মক্কায় পৌঁছে যায়। আবু জান্দাল সংবাদ শুনে মক্কা ছেড়ে এসে আবু বাসীদের সাথে গিয়ে মিলিত হল।

এভাবে মক্কায় কেহ যখন ইসলামের ছায়াতলে সমবেত হতেন, তখনই বাড়ি ছেড়ে এসে সমুদ্র তীরের এ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। ক্রমে অল্পদিনের মধ্যেই এ স্থানে এ ধরনের প্রবাসী মুসলমানদের একটি ছোট-খাট দল গড়ে উঠল। স্থানটি ছিল সমুদ্র পাড়ের গভীর জঙ্গল। সেখানে কোন জনবসতি ছিল না। সেখানে এ অবস্থায় মুসলমানদের ভীষণ কষ্টবরণ করতে হয়েছিল। মক্কার যে সব কাফেলা এ জঙ্গলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতে চেষ্টা করত তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে তাদের মাল-সম্পদ দখল করে শাস্তির ব্যবস্থা করতেন এ জঙ্গলবাসীরা। অল্পদিনের মধ্যেই কাফেরদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। তারা দেখল যে, সমুদ্রতীর বরাবর তাদের যাতায়াত বন্ধ হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল, তখন বাধ্য হয়ে তারা অতি বিনয় ও নম্রতার সাথে হযরত রাসূল (সাঃ)-এর কাছে আবেদন জানাল, যেন সমুদ্রতীরবর্তী জঙ্গল থেকে শাসনগন্ডি বহির্ভূত মুসলমানদের দলটিকে মদীনায় যেন ফিরিয়ে নেয়া হয়। কাফেরদের আবেদনে রাসূল (সাঃ) এ দলটিকে মদীনায় চলে আসার হুকুম পাঠালেন। সহীহ বুখারী শরীফের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, রাসূল (সাঃ)-এর এ আদেশ গিয়ে যখন এ স্থানে পৌঁছল, তখন আবু বাসীর মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করেছিলেন। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর আদেশ নামাটি পাঠ করতে করতে মহান আল্লাহ্র সান্নিধ্যে গমন করেন।

হযরত বেলাল হাবশী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত আবু আবদুল্লাহ বিলাল (রাঃ) বিন রাবাহ রাসূল (সাঃ)-এর দরবারের অন্যতম মহান মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। তাঁর নাম শুনলে প্রতিটি মুসলমানের মাথা ভক্তি-শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ে। তিবরানী (রাঃ) এবং অন্য কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন, রাবাহ প্রকৃতপক্ষে হাবশী ছিলেন। তিনি স্ত্রী হুমামাহ সমভিব্যাহারে এসে মক্কার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিলেন এবং কুরাইশের বনু জুমাহ বংশের গোলামী গ্রহণ করেছিলেন। (অথবা তাঁকে গোলাম বানানো হয়েছিল)। এ গোলামী অবস্থাতে রাসূল (সাঃ) নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রায় ২৮ বছর পূর্বে রাবাহ ও হুমামাহর পুত্র বিলাল (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। বিলাল (রাঃ)-এর যখন জ্ঞান হল, তখন চারদিকে কুফর ও শিরকের ঘনঘটা দেখতে পেলেন। তাঁর মালিক উমাইয়াহ বিন খালফ জুমহিও কট্টর মুশরিক ছিল। তার গোলামীতেই তিনি জীবনের ২৮টি বছর অতিবাহিত করেছিলেন। ইত্যবসরে তাঁর কানে হকের দাওয়াতের আওয়াজ পৌঁছল। এটা ছিল নবুওয়াত প্রাপ্তির সম্পূর্ণ প্রথম যুগ, যখন রাসূল (সাঃ) অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে হকের তাবলীগ শুরু করেছিলেন। হযরত বিলাল (রাঃ) প্রকৃতিগতভাবে অত্যন্ত শরীফ এবং পবিত্র আত্মার মানুষ ছিলেন। সম্ভবত নবুওয়াতের পূর্বেই তিনি রাসূল (সাঃ)-এর উন্নত চরিত্রে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বস্তুত তাওহীদের আওয়াজ শুনা মাত্র তিনি নির্ভাবনায় তাতে সাড়া দিলেন এবং নিজের মন ও প্রাণ রাসূল (সাঃ)-এর জন্য উৎসর্গ করে দিলেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বলেছেন, তিনি সে 'সাত নেক ভাগ্যবান, ব্যক্তিত্বের অন্যতম ছিলেন যাঁরা তাওহীদের ঝাণ্ডাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তিনি মদীনার মসজিদে নববীর মুয়াযযিন ও রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর অতি স্নেহভাজন ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর মনিব উমাইয়া বিন খালফ তাঁকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে নির্যাতন করে লাগল। উমাইয়া বিন্ খালফ ইসলামের ঘোর শত্রু ছিল। সে তার ভৃত্য হযরত বেলাল (রাঃ)-কে ইসলাম ত্যাগ করাতে অত্যন্ত কঠোর ও নির্মম শাস্তির বন্দোবস্ত করেছিল। দুপুরের কড়া রোদে অগ্নিঝরা গরম বালির উপর সে হযরত বেলাল (রাঃ)-কে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে তাঁর বুকের উপর একটা বড় পাথর চাপিয়ে দিত। এর ভারে হযরত বিলাল (রাঃ) একটুও নড়তে পারতেন না। উপরে সূর্যের কড়া তাপ, নিচে আগুনের মত গরম পানি। এরকম নিষ্ঠুর অত্যাচার করার একমাত্র কারণ ছিল হয়, তিনি মৃত্যুবরণ করবেন, নয়ত ইসলাম পরিত্যাগ করবেন। কিন্তু এমন অসহনীয় নির্যাতন ভোগ করেও তিনি ইসলাম পরিত্যাগ করেননি। প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়,

প্রেমের সাধক অসহ্য যাতনায় ছটফট করতে করতে মাঝে মাঝে গলা ছেড়ে চীৎকার করে বলতেন, আহাদ, আহাদ অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। রাতেও তাঁর শান্তি ছিল না। তাঁকে তখন বেত মারা হত, ফলে আগের দিনের জখমগুলো তরতাজা হয়ে ওঠত। পরে তাঁকে যখন আবার গরম বালিরাশির উপর শুইয়ে দেয়া হত, তখন তার জখম থেকে অঝোর ধারায় রক্ত প্রবাহিত হত। তারা তাঁর গলায় দড়ি বেঁধে মক্কার রাজপথে টেনে হেচড়ে নিয়ে যেত আর সন্ধ্যার দিকে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়ে যেত। তাঁকে নির্যাতন শুধুমাত্র তাঁর মনিবই করত এমন নয়, সাথে কখনও আবু জাহল, কখনও উমাইয়া কখনও অন্য কাফেরারাও পালাক্রমে অত্যাচার করত। এত অত্যাচার নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি কখনও তাঁর আহাদকে ভুলেননি। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁর এ করুণ অবস্থা দেখে বহু অর্থের বিনিময়ে তাঁকে আযাদ করে দেন। আরবের পৌত্তলিকরা তাদের মূর্তিগুলোকে নিজেদের মাবুদ বলে মান্য করত। ইসলামের তৌহিদ বাণী তাদের ধর্ম বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেছিল, সে জন্যেই হযরত বিলাল (রাঃ)-কে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে তাদের এত বেশী আগ্রহ ছিল। কিন্তু তৌহিদের বিশ্বাসী ইসলামের আমানতদার হযরত বেলাল (রাঃ) শত্রুর সহস্র নির্যাতন সহ্য করেও আল্লাহ্র একত্বকে মানুষের সামনে অক্ষয় করে ফুটিয়ে তুলতে তৎপরতা দেখিয়ে দেন। হযরত বিলাল (রাঃ) ধৈর্য এবং সত্যতা ও আন্তরিকতার যে চিত্র ইতিহাসের পাতায় অঙ্কিত করে গেছেন তা প্রতিটি মুসলমানের জন্য চিরকালের মত মশাল হিসাবে গণ্য হবে। তাঁর নাম শুনে প্রত্যেক মুসলমানের নাড়ির গতিবেগ বেড়ে যায়। হায়! সে যদি হযরত বিলাল (রাঃ)-এর রাসূল (সাঃ)-এর প্রেমের হাজার-লাখ ভাগের এক ভাগও পেত! তাহলে তার আখিরাত সুন্দর হত।

নবীবিহীন মদীনা

হযরত রাসূল (সাঃ)-এর তিরোধানের পর হযরত বেলাল (রাঃ) মদীনায় আর অবস্থান করতে পারেননি। নবী শূণ্য মদীনায় তাঁর কিভাবে থাকা সম্ভব? কাকে শোনাবেন, তিনি তাঁর মধুর আযান ধ্বনি? শোকে, দুঃখে, বিচ্ছেদ কাতরতায় একদিন তিনি মদীনা ত্যাগ করে জিহাদে জীবন দান করার মানসে দূরদেশে প্রত্যাগমন করেন। বহুদিন তিনি মদীনায় ফিরে আসেননি। একদিন স্বপ্নে রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনলেন, হে বলাল! একি রকম যুলুম! তুমি যে আর আমার কাছে আসনা? স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে প্রেমিকের মনে পুনরায় প্রেমের ফল্গুধারা প্রবাহিত হল। ভোর হতে না হতেই মদীনার দিকে ছুটলেন। রাসূল

(সাঃ)-এর বংশধর হযরত হাসান ও হযরত হোসায়েন (রাঃ) তাঁদের অতি আপনজন হযরত বেলালকে পেয়ে যেন হারানো সম্পদ ফিরে পেলেন। তাঁরা তাঁর আযান শোনার জন্য হযরত বেলালকে অনুরোধ করলেন। অন্যদিকে নবী বংশধরের অনুরোধ উপেক্ষা করাও যে সম্ভব নয়। তিনি উদাত্তকণ্ঠে তওহীদের সুমধুর বাণী পুনরায় চারদিকে ঘোষণা করে দিলেন। মদীনার আকাশ বাতাস মুখরিত করে হযরত বেলালের আমার ধ্বনি দিক-বিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল। মদীনার নর-নারী তাঁদের চির পরিচিত স্বর শুনে রোদন করতে করতে মসজিদে নববীর দিকে ছুটে এলেন। সেখানে হযরত বেলাল (রাঃ)-কে দেখে তাঁদের নবী শোক যেন বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়ে উথলে উঠল। কিছুদিন মদীনায় বসবাস করার পর হযরত বেলাল (রাঃ) স্বীয় বাসস্থান দামেস্কে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ২০ হিজরীতে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। -(উসদুল গাবা)

আবুযর গিফারী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) একজন দুনিয়া বিরাগী রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবী ছিলেন। তাঁর পূর্ব পরিচিতি ছিল এরূপ- বাইরের জগতের সাথে মক্কার সংযুক্তি ঘটিয়েছে যে, 'আদ্দান' উপত্যকাটি, সেখানেই ছিল গিফার গোত্রের বসতি। মক্কার কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা ওখান দিয়ে সিরিয়া যাতায়াত করত। এসব কাফেলার নিরাপত্তার বিনিময়ে যে সামান্য অর্থ লাভ করত তা দিয়েই তারা জীবিকা নির্বাহ করত। ডাকাতি, রাহাজানিও ছিল তাদের পেশা। যখন কোন বাণিজ্য কাফেলা তাদের দাবী অনুযায়ী খাদ্যসামগ্রী বা অর্থ আদায় করত না তখন তারা লুটতরাজ চালাত। জুনদুব ইব্‌ন জুনাদাহ আবুযার নামেই যিনি পরিচিত-তিনিও ছিলেন এ কবীলারই সন্তান। বাল্যকাল থেকেই তিনি অসীম সাহস, প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও দূরদৃষ্টির জন্য ছিলেন সকলের থেকে স্বতন্ত্র। জাহেলী যুগে জীবনের প্রথম ভাগে তাঁর পেশাও ছিল রাহাজানি। গিফার গোত্রের একজন দুঃসাহসী ডাকাত হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তবে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর জীবনে ঘটে যায় এক পরিবর্তন। তাঁর গোত্রীয় লোকেরা এক আল্লাহ ছাড়া যে সকল মূর্তির পূজা করত, তাতে তিনি গভীর ব্যথা অনুভব করতে শুরু করেন।

সমগ্র আরব বিশ্বে সে সময় যে, ধর্মীয় অনাচার, অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের সয়লাব তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি অধীর ভাবে অপেক্ষা করতে থাকেন এমন একজন ব্যক্তির জন্য যিনি মানুষের বুদ্ধি- বিবেক ও অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে তাদের নিয়ে আসবেন।

তিনি রাহাজানি পরিত্যাগ করে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদাতের দিকে ঝুঁকে পড়েন, যখন সমগ্র আরব দেশ গোমরাহীর অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ছিল। হযরত আবু মাশার বলেনঃ আবুযর জাহিলী যুগেই একত্ববাদী ছিলেন। এক আল্লাহ ছাড়া আর কাকেও তিনি উপাস্য বলে বিশ্বাস করতেন না। অন্য কোন মূর্তি বা দেব-দেবীর পূজাও করতেন না। তাঁর বিশ্বাস ও আল্লাহর ইবাদত মানুষের কাছে পরিচিত ছিল। এ কারণে, যে ব্যক্তি সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সংবাদ তাঁকে দিয়ে বলেছিলঃ আবুযর, তোমার মত মক্কায় এক ব্যক্তি "লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহ বলে থাকেন। তিনি কেবল মুখে মুখেই তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন না, সে জাহিলী যুগে নামাযও আদায় করতেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের তিন বছর পূর্ব থেকেই নামায আদায় করতাম। লোকেরা জিজ্ঞেস করেছিল, কাকে উদ্দেশ্য করে? বললেন। আল্লাহকে। আবার প্রশ্ন করা হয়েছিল কোন দিকে মুখ করে? বলেছিলেন, যে দিকে আল্লাহ ইচ্ছা করতেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটিও বেশ চমকপ্রদ। ইব্‌নে হাজার "আল-ইসাবা" গ্রন্থে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। সংক্ষেপে এভাবে বলা যায়, তিনি তাঁর গোত্রের সাথে বসবাস করছিলেন।

একদিন সংবাদ পেলেন, মক্কায় এক নতুন নবীর আবির্ভবাব হয়েছে, তাই তিনি তার ভাই আনিসকে ডেকে বললেন ঃ তুমি একটু মক্কায় যাবে। সেখানে যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করেন এবং আসমান থেকে তাঁর কাছে ওহী আসে বলে প্রচার করে থাকেন, তাঁর সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করবে, তাঁর মুখের কিছু কথা শুনবে। তারপর ফিরে এসে আমাকে অবহিত করবে। আনিস মক্কায় চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করে নিজ গোত্রে ফিরে এলেন। আবুযর খবর পেয়ে তখনই ছুটে গেলেন আনিসের কাছে। অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে নতুন নবী সম্পর্কে নানান কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। আনিস বললেন ঃ কসম আল্লাহর। আমি তো লোকটিকে দেখলাম, মানুষকে তিনি মহৎ চরিত্রের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন। আর এমন সব কথা বলেন যা কাব্য বলেও মনে হল না। মানুষ তাঁর সম্পর্কে কি বলাবলি করে? কেহ বলে তিনি একজন যাদুকর, কেহ বলে গণক, আবার কেউ বলে কবি। আল্লাহর কসম। তুমি আমার তৃষ্ণা মেটাতে পারলে না, আমার আকঙ্খাও পূরণ করতে সক্ষম হলে না। তুমি কি পারবে আমার পরিবারের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে, যাতে আমি মক্কায় গিয়ে স্বচক্ষেই তাঁর অবস্থা দেখে আসতে পারি?

নিশ্চয়ই। তবে আপনি মক্কাবাসীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন। পরদিন সকালে আবুযর চললেন মক্কার উদ্দেশ্য। সাথে নিলেন কিছু পাথেয় ও এক মাশক পানি। সর্বদা তিনি শঙ্কিত , ভীত চকিত। না জানি কেহ জেনে ফেলে তাঁর উদ্দেশ্য। এ অবস্থায় তিনি পৌঁছলেন মক্কায়। কোন ব্যক্তির কাছে মুহাম্মদ সম্পর্কে কোন কথা জিজ্ঞেস করা তিনি সমীচীন মনে করলেন না। কারণ, তাঁর জানা নেই এ জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিটি মুহাম্মদের বন্ধু না শত্রু? দিনটি কেটে গেল। রাতের আঁধার নেমে এল। তিনি ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। বিশ্রামের উদ্দেশ্যে তিনি শুয়ে পড়লেন মাসজিদুল হারামের এক কোণে। আলী ইব্‌নে আবি তালিব যাচ্ছিলেন সে পথ দিয়েই। দেখেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, লোকটি মুসাফির। ডাকলেন, আসুন, আমার বাড়িতে। আবুযর গেলেন তাঁর সাথে এবং সেখানেই রাতটি কাটিয়ে দিলেন।

সকাল বেলা পানির মশক ও খাবারের পুটলিটি হাতে নিয়ে আবার ফিরে এলেন মাসজিদে । তবে দু'জনের একজনও একে অপরকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। পরের দিনটিও কেটে গেল। কিন্তু নবীর সাথে পরিচয় হল না। আজও তিনি মাসজিদেই শুয়ে পড়লেন। আজও আলী (রাঃ) আবার সে পথ দিয়েই যাচ্ছিলেন। বললেন ঃ ব্যাপার কি, লোকটি আজও তাঁর গন্তব্যস্থল চিনতে পারেনি? তিনি তাঁকে আবার সাথে করে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এ রাতটিও সেখানে কেটে গেল। এদিনও কেহ কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। একইভাবেই তৃতীয় রাতটি নেমে এল। আলী (রাঃ) আজ বললেন ঃ বলুন তো আপনি কি উদ্দেশ্য মক্কায় এসেছেন? তিনি বললেন, যদি আমার কাছে অঙ্গীকার করেন আমার কাঙ্খিত বিষয়ের দিকে আপনি আমাকে পথ দেখাবেন তাহলে আমি বলতে পারি। আলী (রাঃ) অঙ্গীকার করলেন। আবুযর বললেন ঃ আমি অনেক দূর থেকে মক্কায় এসেছি নতুন নবীর সাথে সাক্ষাত করতে এবং তিনি যে সব কথা বলেন তার কিছু শুনতে। আলীর (রাঃ) মুখমন্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, আল্লাহর কসম, তিনি নিশ্চিত সত্য নবী । একথা বলে তিনি নানা ভাবে নবীর (সাঃ) পরিচয় দিলেন।

তিনি আরও বললেন, সকালে আমি যেখানে যাই, আপনি আমাকে অনুসরণ করবেন। যদি আমি আপনার জন্য আশংকাজনক কোন কিছু লক্ষ্য করি তাহলে প্রস্রাবের ভান করে দাঁড়িয়ে যাব। আবার যখন চলব, আমাকে অনুসরণ করে চলতে থাকবেন। এভাবে আমি যেখানে প্রবেশ করি আপনিও সেখানে প্রবেশ করবেন। প্রিয় নবী দর্শন লাভ ও তাঁর উপর অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ শ্রবণ

করার প্রবল আগ্রহ ও উৎকণ্ঠায় আবুযর সারাটা রাত বিছানায় স্থির হতে পারলেন না। পরদিন সকালে মেহমান সাথে করে আলী (রাঃ) চললেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাড়ির দিকে। আবুযর তাঁর পিছনে পিছনে। পথের আশ পাশের কোন কিছুর প্রতি তাঁর কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। এভাবে তাঁরা পৌঁছলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে। আবুযর সালাম করলেন। আস-সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। রাসূল (সাঃ) জবাব দিলেন, 'ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। এভাবে আবুযর সর্বপ্রথম ইসলামী কায়দায় রাসূল (সাঃ)-কে সালাম পেশ করার গৌরব অর্জন করেন। অতঃপর সালাম বিনিময়ের এ পদ্ধতিই গৃহীত ও প্রচারিত হয়।

রাসূল (সাঃ) আবুযরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে শুনালেন। সেখানে বসেই আবুযর কালেমায়ে তাওহীদ পাঠ করে নতুন দ্বীনের মধ্যে প্রবেশের ঘোষণা দিলেন। এর পর ঘটনা আবুযর এভাবে বর্ণনা করছেন। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল (সাঃ)-এর সাথে আমি মক্কায় অবস্থান করতে লাগলাম। তিনি আমাকে ইসলামের নানান বিষয় শিক্ষা দিলেন, মক্কায় কারও কাছে তোমার ইসলাম গ্রহণের কথা বললে জীবনের আশঙ্কা রয়েছে, আমি বললাম যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি, আমি মক্কা ছেড়ে যাবনা, যতক্ষণ না মসজিদে গিয়ে কুরাইশদের মাঝে প্রকাশ্যে সত্যের দাওয়াত দিচ্ছি। রাসূল (সাঃ) নীরব হয়ে গেলেন। আমি মসজিদে এলাম। কুরাইশরা তখন একত্রে বসে গুজব করছে। আমি তাদের মাঝে হাযির হয়ে যতদূর সম্ভব উচ্চকণ্ঠে সম্বোধন করে বললাম, 'কুরাইশ গোত্রের লোকেরা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল। আমার কথাগুলো তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করতেই তারা ভীত-চকিত হয়ে পড়ল। একযোগে তারা লাফিয়ে উঠে বললঃ এ ধর্মত্যাগীকে ধর। তারা দৌঁড়ে এস আমাকে বেদম প্রহার শুরু করল। রাসূলের (সাঃ) চাচা আব্বাস আমাকে দেখে চিনলেন। তাদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি আমার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করলেন। একটু সুস্থ হয়ে আমি রাসূল্লাহর (সাঃ)-এর কাছে ফিরে গেলাম। আমার অবস্থা দেখে তিনি বললেন, তোমাকে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলাম না? বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিজের মধ্যে এক প্রবল ইচ্ছা অনুভব করছিলাম। সে ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছি মাত্র। তিনি বললেন, তোমর গোত্রের কাছে ফিরে যাও। যা দেখলে এবং যা কিছু শুনলে, তাদেরকে অবহিত

করবে, তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানাবে। হতে পারে আল্লাহ্ তোমার দ্বারা তাদের উপকৃত করবেন এবং তোমাকে প্রতিদান দিবেন । যখন তুমি জানবে, আমি প্রকাশ্য দাওয়াত দিচ্ছি, তখন আমার কাছে চলে আসবে। আমি ফিরে এলাম আমার গোত্রীয় লোকদের আবাসভূমিতে। আমার ভাই আনিস এল আমার সাথে সাক্ষাত করতে। সে জিজ্ঞেস করলঃ কি করলেন? বললাম, ইসলাম গ্রহণ করে বিশ্বাসী হয়েছি। তখনই দিলেন। সে বলল, আপনার দ্বীন প্রত্যাখ্যান করার ইচ্ছা আমার নেই। আমিও ইসলাম গ্রহণ করে বিশ্বাসী হলাম।

তারপর আমরা দু'ভাই একত্রে মায়ের কাছে গিয়ে তাঁকেও ইসলামের দাওয়াত দিলাম। তোমাদের দুভায়ের দ্বীনের প্রতি আমার কোন অনীহা নেই–একথা বলে তিনিও ইসলাম কবুল করার ঘোষণা দিলেন। সে দিন থেকে এ বিশ্বাসী পরিবার নিরলসভাবে গিফারী গোত্রের মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে থাকেন। এ কাজে কখনও তাঁরা হতাশ হননি কখনও মনোবল হারাননি। তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টায় এ গোত্রের বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁদের মধ্যে নামাযের জামায়াত প্রতিষ্ঠিত হয় । তবে এক দল লোক বলে, আমরা আমাদের ধর্মের উপর অটল থাকব। রাসূলুল্লাহ মদীনায় এলে আমরা ইসলাম গ্রহণ করব। রাসূল (সাঃ) মদীনায় হিজরাতের পর তারাও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ গিফার গোত্র সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, গিফার গোত্রকে আল্লাহ্ তাঁদের শান্তি ও নিরপত্তা দিয়েছেন। আবুযর মক্কা থেকে ফিরে এসে গোত্রীয় লোকদের সাথে মরুভূমিতে অবস্থান করতে থাকেন। একে একে বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ শেষ হয়। অতঃপর তিনি মদীনায় এলেন নিরবছিন্নভাবে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সাহচর্যে। তিনি রাসূলুল্লাহর কাছে আবেদন করলেন খিদমত দানের জন্য। তাঁর এ আবেদন মঞ্জুর হল। মদীনায় অবস্থানকালে সবটুকু সময় তিনি অতিবাহিত করতেন রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সেবায়। এটাই ছিল তাঁর সর্বাধিক প্রিয় কাজ।

তিনি নিজেই বলতেনঃ রাসূলুল্লাহর (সাঃ) খিদমত করতাম, আর অবসর সময়ে মাসজিদে এসে বিশ্রাম নিতাম। ইব্‌নে ইসহাক বলেন ঃ আবুযর হিজরত করে মদীনায় এলে রাসূল (সাঃ) মুনজির ইব্‌নে আমর ও আবুযরের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। তবে এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক ওয়াকিদীর মত হল, আবুযর মীরাসের আয়াত নাযিল হওয়ার পর মদীনায় হিজরতের করে এসেছিলেন। সুতরাং ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপনের নিয়মটি তখন রহিত হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহর (সাঃ)-এর সাথে তাঁর যুদ্ধে অংশ গ্রহণের বিস্তারিত তথ্য জানা যায়

না। তবে তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণের একটি ঘটনা আল্লামা ইব্‌নে হাজার আসকালানী আল-ইসাবা গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন তাবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন তখন লোকেরা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধে গমনের ব্যাপারে ইতস্ততা প্রকাশ করতে লাগল। কোন ব্যক্তিকে দেখা না গেলে সাহাবীরা বলতেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ অমুক আসেনি। জবাবে তিনি বলতেন, যদি তার উদ্দেশ্যে মহৎ হয় তাহলে শিগ্‌গীরই আল্লাহ্ তাকে তোমাদের সাথে মিলিত করবেন। অন্যথায় আল্লাহ্ তাকে তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোমাদের নিরাপদ করেছেন। একসময় আবুযরের নামটি উল্লেখ করে বলা হল, সেও পিঠটান দিয়েছে।

প্রকৃত ঘটনা হল, তাঁর উটনী ছিল মন্থরগতি । প্রথমে তিনি উটটিকে দ্রুত চালাবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়ে জিনিসপত্র নামিয়ে নিজের কাঁধে উঠিয়ে পায়ে হাঁটা শুরু করেন এবং অগ্রবর্তী মানযিলে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে মিলিত হন। এক সাহাবী দূর থেকে তাঁকে দেখে বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ রাস্তা দিয়ে কে একজন যেন আসছে। তিনি বললেনঃ আবুযরই হবে। লোকেরা গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে চিনতে পারল। বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লার কসম, এতো আবুযরই। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ আবুযরের উপর রহমত করুন। সে একাকী চলে, একাকীই মরবে, কিয়ামতের দিন একাই উঠবে। (তারীখুল ইসলামঃ আল্লামা যাহাবী ৩য় খন্ড) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটি অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। হযরত আবুযর ছিলেন প্রকৃতিগতভাবেই সরল, সাদাসিদে, দুনিয়া বিরাগী ও নির্জনতা প্রিয় স্বভাবের। এ কারণে রাসূল (সাঃ) তাঁর উপাধী দিয়েছিলেন মসিরুল ইসলাম। রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পর তিনি দুনিয়ার সাথে একেবারেই সম্পর্কহীন হয়ে পড়েন। প্রিয় নবীর বিচ্ছেদ তাঁর অন্তর অভ্যন্তরে যে দাহ শুরু হয়েছিল তা আর কখনও প্রশমিত হয়নি।

এ কারণে হযরত আবু বকরের (রাঃ) খিলাফতকালে রাষ্টের কোন কাজেই তিনি অংশ গ্রহণ করেননি। আবু বকালের ইন্তিকালে তাঁর ভগ্নহৃদয় আরও চুরমার হয়ে যায়। তাঁর দৃষ্টিতে তখন মদীনার সুবোভিত উদ্যানটি পত্র-পল্লববিহীন বলে প্রতিভাত হয়। তিনি মদীনা ত্যাগ করে শামে সিরিয়া প্রবাসী হন। আবু বকর ও উমারের (রাঃ) খিলাফতকাল পর্যন্ত ইসলামের সহজ ও সরল জীবন ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। বিজয় ও ইসলামী খিলাফতের বিস্তৃতির

সাথে যখন ধন ও ঐশর্য্যের প্রাচুর্য দেখা দেয়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই চাকচিক্য ও জৌলুস সে স্থান দখল করে নেয়। হযরত উসমান (রাঃ)-এর যুগেই বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে শান-শওতের সূচনা হয়। সাধারণ জনজীবনেও এর কিছুটা প্রভাব পড়ে। তাদের মধ্য রাসূল (সাঃ)-এর আমলের সরলতার পরিবর্তে ভোগ ও বিলাসিতার ছাপ ফুটে উঠে। আবুযর মানুষের কাছে রাসূল (সাঃ)-এর আমলের সে সহজ-সরল আড়ম্বহীন জীবন ধারার অনুসরণ আশা করতেন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল সকেলই তাঁর মত ধন-দৌলতের প্রতি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হোক। তাঁরা আল্লাহ্ নির্ভর বিশ্বাস ও মতবাদে আগামীকারের জন্য কোন কিছুই আজ সঞ্চয় করা যাবে না। তিনি বিশ্বাস করতেন, অন্যকে অভুক্ত ও উলঙ্গ রেখে সম্পদ পুঞ্জিভূত করার কোন অধিকার কোন মুসলিমের নেই। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) ও অন্যান্য আমীরগণ মনে করতেন, সম্পদশালী লোকদের উপর আল্লাহ্ যে যাকাত ফরয করেছেন তা সঠিকভাবে আদায় করার পর অতিরিক্ত অর্থ জমা করার ইখতিয়ার প্রতিটি মুসলিমের আছে। এ মতপার্থক্য বৃদ্ধি পেয়ে শেষ পর্যন্ত ঝগড়ারও রূপ লাভ করে। আবুযর অন্যন্ত নির্ভীভাবে এ সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধের প্রতিবাদ করেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী হওয়ার কারণে তাদের কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের লক্ষ্যবস্তু বলে গণ্য করতে থাকেন। আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জিভূত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেনা তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। (আত্তওবাহ)।

এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে ইয়াহুদী ও নাসারাদের আলোচনা এনেছে। এ কারণে আমীর মু'আবিয়ার বক্তব্য ছিল, এ আয়াতের সম্পর্ক এ সব বিধর্মীদের সাথে। আর আবুযর মনে করেন, আয়াতটির উদ্দেশ্য মুসলিম অমুসলিম সকলেরই। দ্বিতীয়ত ঃ আবুযর আল্লাহ্র পথে ব্যয় না করার অর্থ এটাই বুঝতেন যে, সে নিজের ধন সম্পদ আল্লাহ্র পথে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেয় না। আর আমীর মুআবিয়ার ধারণা ছিল, এটা কেবল যাকাতের সাথে সম্পৃক্ত । এ ভাবে হযরত আবুযর স্বীয় চিন্তা -দর্শন ও মত অনুযায়ী অত্যন্ত কঠোরভাবে সমালোচনা করেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) মনে করেন, এ অবস্থা চলতে থাকলে দেশে যে কোন সময় বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। তিনি খলিফা উসমান (রাঃ)-কে এ নাজুক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং অনুরোধ করলেন তিনি যেন আবুযরকে মদীনায় তলব করেন। হযরত উসমান তাঁকে মদীনায় ডেকে পাঠান।

একদিন আবুযর বসে আছেন। তাঁর সামনে খলীফা উসমান (রাঃ) কা'ব (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, যে ব্যক্তি সম্পদ পুঞ্জিভুত করে, তার যাকাত দেয় একং আল্লাহ্র পথে ব্যয় ও করে। এমন ব্যক্তি সম্পর্কে ভাল আশা পোষণ করা যায়? এ কথা শুনে আবুযর তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। কা'বের মাথার উপর হাতের লাঠিটি তুলে ধরে বলালেন, আপনি আমার কাছে থাকুন, দুগ্ধবতী উটনী প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় আপনার দরজায় হাযির হবে। জবাবে তিনি বললেন ঃ তোমার এ দুনিয়ার কোন প্রয়োজন আমার নেই। একথা বলে তিনি চলে গেলেন। অবশেষে হযরত উসমান (রাঃ) তাঁকে অনুরোধ জানালেন, মদীনা থেকে বহুদুরে মরুভূমির মাঝখানে রাবজা নামক স্থানে গিয়ে বসবাস করার জন্য। অনেকের মতে, তিনি স্বেচ্ছায় সেখানে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। লোকালয় থেকে বহুদূরে নির্জন ভোগ বিলাসী জীবনকে পরিহার করে আল্লাহ্র রাসুল (সাঃ)-এর পরকাল আসক্ত জীবনকে কঠোরভাবে অনুসরণ করে আমরণ সেখানেই অবস্থান করেন।

হযরত আবুযর (রাঃ) ওফাতের কাহিনীটিও অত্যন্ত বেদনাদায়ক। হিজরী ৩১ মতান্তরে ৩২ সনে তিনি রাবজার মরুভুমিতে ইনতিকাল করেন। তাঁর সহধর্মিনী তাঁর অন্তিম কালীন অবস্থার বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ আবুয়রের অবস্থা যখন খুবই খারাপ হয়ে পড়ল, আমি তখন কাঁদতে শুরু করলাম। তিনি বললেন, কাঁদছ কেন? বললাম ঃ এক নির্জন মরুভূমিতে আপনি পরকালের দিকে যাত্রা করছেন। এখানে আমার ও আপনার ব্যবহৃত বস্ত্র ছাড়া অতিরিক্ত এমন বস্ত্র নেই যা দ্বারা আপনার কাফন দেয়া যেতে পারে। তিনি বললেন ঃ কান্না থামাও। তোমাকে একটি সুসংবাদ দিচ্ছি। রাসূল (সাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, যে মুসলিমের দুটি অথবা তিনটি সন্তান মৃত্যবরণ করেছে, জান্নাতের আগুন থেকে বাঁচার জন্য তাই যথেষ্ট। তিনি কতিপয় লোকের সামনে তার মধ্যে আমিও ছিলাম বলেছিলেন ঃ তোমাদের মধ্যে একজন মরুভুমিতে মৃত্যুবরণ করবে এবং তার মরণ সময় মুসলিমদের একটি দল সেখানে অকস্মাৎ উপস্থিত হবে। আমি ছাড়া সে লোকগুলোর সকলেই লোকালয়ে ইন্তেকাল করেছে। এখন মাত্র আমিই বেঁচে আছি। তাই নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, সে ব্যক্তি আমিই। আমি কসম করে বলেছি, আমি মিথ্যা বলছিনা এবং যিনি এ কথা বলেছিলেন তিনিও কোন মিথ্যা বলেননি। তুমি রাস্তার দিকে চেয়ে দেখ, গায়েবী সাহায্য অবশ্যই এসে যাচ্ছে। আমি বললাম ঃ না, তুমি যেয়ে দেখ।

সুতরাং এক দিকে দৌড় গিয়ে টিলার উপর উঠে দূরে তাকিয়ে দেখলাম, অপর দিকে ছুটে এসে তাঁর সেবা শুশ্রুষা করেছিলাম। এরূপ ছুটাছুটির ও অনুসন্ধান চলছিল। এমন সময় দূরে কিছু আরোহী দৃষ্টিগোচর হল। আমি তাদেরকে ইশারা করলে তারা দ্রুতগতিতে আমার কাছে এসে থেমে গেল। আবুযর সম্পর্কে তারা প্রশ্ন করল, ইনি কে? বললাম ঃ আবুযর। রাসূলুল্লাহর (সাঃ)-এর সাহাবী? বললাম ঃ হ্যাঁ। মা-বাবা কুরবান হোক, একথা বলে তারা আবুযরের কাছে গেলেন। আবুযর প্রথমে তাঁদেরকে রাসূল (সাঃ)-এর ভবিষ্যত বাণী শুনলেন। তারপর অসিয়ত করলেন, যদি আমার কাছে অথবা আমার স্ত্রীর কাছে থেকে কাফনের পরিমাণ কাপড় পাওয়া যায় তাহলে তা দিয়েই আমাকে কাফন দেবে। তারপর তাঁদেরকে কসম দিলেন, যে ব্যক্তি সরকারের ক্ষুদ্রতম পদেও অধিষ্ঠিত সে যেন তাঁকে কাফন না পরায়।

ঘটনাক্রমে এক আনসারী যুবক ছাড়া তাদের মধ্যে অন্য সকলেই কোন না কোন সরকারী দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। আবুযর তাঁকেই কাফন পরাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। এ কাফেলাটি ছিল ইয়ামেনী। তারা কুফা থেকে এসেছিল। আর তাঁদের সাথে ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) । এ কাফিলার সাথে তিনি ইরাক যাচ্ছিলেন। তিনিই আবুযরের জানাযার ইমামতি করেন এবং সকলে মিলে তাঁকে রাবজার মরুভূমিতে দাফন করেন।

হযরত আবুযর থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট আটাশ। তন্মধ্যে বারোটি হাদীসে মুত্তফাক আলাইহি অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন। দুটি বুখারী ও সাতটি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। অন্যদের তুলনায় তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এত কম হওয়ার কারণ, তিনি সব সময় চুপচাপ থাকতেন, নির্জনতা পছন্দ করতেন এবং মানুষের সাথে মেলা মেশা কম করতেন। এ কারণে তাঁর জ্ঞানের তেমন প্রচার হয়নি। অথচ হযরত আনাস ইবনে মালিক, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখের ন্যায় বিদ্যান সাহাবীগণ তাঁর তারীখে দিমাশক গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) কে আবুযর (রাঃ) জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, এমন জ্ঞান তিনি লাভ করেছেন যা মানুষ অর্জন করতে অক্ষম। তারপর সে জান আগুনে সেক দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু তা থেকে কোন

খাদ বের হয়নি। এ আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আসমানের নীচে ও যমীনের উপরে আবুযর সর্বাধিক সত্যবাদী ব্যক্তি। হযরত উসমান (রাঃ) খিলাফতকালে আবুযর (রাঃ) একবার হজ্বে গেলেন। এক ব্যক্তি এসে বলল, উসমান (রাঃ) মিনায় অবস্থান কালে চার রাকাআত নামায আদায় করেছেন (অর্থাৎ কঠোর ভাষায় নিন্দা করে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ), আবু বকর ও উমরের পিছনে আমি নামায আদায় করেছি। তাঁরা সকলে দু'রাকাআত পড়েছেন। একথা বলার পর তিনি নিজেই নামাযের ইমামতি করলেন এবং চার রাকাতআতেই আদায় করলেন। লোকেরা বলল, আপনিতো আমীরুল মুমিনীনের সমলোচনা করলেন আর এখন নিজেই চার রাকাআত আদায় করলেন। তিনি বললেন, মতভেদ খুবই খারাপ। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আমার পরে যে আমীর হবে, তাঁদের অপমান করবেনা। যে ব্যক্তি তাঁদের অপমান করার ইচ্ছা করবে সে ইসলামের সুদৃঢ় রজ্জু স্বীয় কাঁধ থেকে ছুড়ে ফেলবে এবং নিজের জন্য তওবার দরজা বন্ধ করে দেবে। (মুসনাদে আহমদ)।

রাসূলুল্লাহর (সাঃ) ইন্তিকালের পর যখনই পবিত্র নামটি তাঁর জিহবায় এস যেত, চোখ থেকে অঝোরে অশ্রুধারা প্রবাহিত হত। আহনাফ বিন কায়েস বর্ণনা করেন, আমি একবার বাইতুল মাকাদ্দাসে এক ব্যক্তিকে একের পর এক বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। যখন দ্বিতীয়বার তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি বলতে পারেন আমি জোড় না বেজোড় নামায আদায় করেছি? তিনি বললেন, আমি না জানলে ও আল্লাহ্ নিশ্চয়ই জানেন। তারপর বললেন ঃ আমার বন্ধু আবু কাসিম আমাকে বলেছেন এতটুকু বলেই তিনি কাঁদতে লাগলেন। তার পর বললেন ঃ আমার বন্ধু আবু কাসিম আমাকে বলেছেন এবার কান্নায় কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। অবশেষে নিজেকে সম্বরণ করে বললেন ঃ আমার বন্ধু আবুল কাসিম (সাঃ) বলেছেন ঃ যে বান্দা আল্লাহ্‌কে একটি সিজদাহ করে, আল্লাহ্ তার একটি দরজা বৃদ্ধি করেন এবং তার একটি পাপ মোচন করে একটি নেকী লিপিবদ্ধ করেন। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? তিনি বললেন ঃ আবুযর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবী। একদিন এক ব্যক্তি আবুযর (রাঃ) কাছে এসে সে তাঁর ঘরের চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখল। গৃহস্থালীর কোন সামগ্রী দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করল, আবুযর আপনার সামান পত্র কোথায়? তিনি বললেন, আখিরাতে আমার একটি বাড়ি আছে, আমার সব উৎকৃষ্ট সামগ্রী সেখানেই পাঠিয়ে দিয়েছি। একদিন সিরিয়ার আমীর তাঁর কাছে তিন'শ দীনার পাঠিয়ে বলেন আপনার প্রয়োজন পূর্ণ করুন। শামের আমীর কি আমার থেকে অধিকতর নীচ কোন আল্লাহ্‌র বান্দাকে পেল না? একথা বলেই তিনি দীনারগুলো ফেরত পাঠালেন।

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) মূলত একজন পারসীক জরথুস্ত্রীয় ধর্মাবলম্বী ছিলেন। জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য সময় তিনি সে ধর্মে অতিবাহিত করেন। পরবর্তীতে জরথুস্ত্রীয় ধর্ম ত্যাগ করে তিনি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি ইহুদী ও খৃষ্টান পন্ডিতদের মুখে মদীনায় মহানবী (সাঃ)-এর হিজরত হবে বলে শুনতে পেয়ে সে দিকে যাত্রা শুরু করেন। পথিমধ্যে কয়েক জায়গায় বিক্রি হয়ে পরিশেষে এক ইহুদীর কৃতদাসে পরিণত হন। কৃতদাস থাকাকালে একদিন তিনি মহানবী (সাঃ)এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তার সম্মুখে সামান্য কিছু পেশ করে বলেন এগুলো হচ্ছে 'সাদাকাহ'। রাসূল (সাঃ)-ইরশাদ করেন, আমি সাদাকাহ ভক্ষন করি না আমার জন্যে তা হারাম। এরপর অন্য একদিন উপস্থিত হয়ে কিছু পেশ করে বলেন, এগুলো 'হাদিয়া'। রাসূল (সাঃ) এগুলো গ্রহণ করেন। অনুরূপ অন্য একদিন উপস্থিত হয়ে তিনি রাসূল (সাঃ)এর পৃষ্ঠ মুবার 'মোহরে নবুওয়াত' প্রত্যক্ষ করেন ও সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। এসব করার কারণ, সালমান ফারসী (রাঃ) জানতে পেরেছিলেন যে, রাসূল (সাঃ) সাদাকাহ ভক্ষণ করবেন না, বরং তিনি হাদিয়া গ্রহণ করবেন এবং তাঁর পৃষ্ঠদেশে নুবুওয়াতের মোহর অংকিত থাকবে।

পরে রাসূল (সাঃ) হযরত সালমান ফারসীকে তার নিজের মুক্তির ব্যাপারে ভাববার কথা বলেন। ফলে তিমি নিজ মুক্তির ব্যাপারে চল্লিশ আওফিয়া (একশ পাঁচ তোলা) সোনার উপর চুক্তিবদ্ধ হন। চুক্তিতে শর্ত ছিল যে, তিনি তিনশটি খেজুর চারা রোপণ করবেন এবং এ চারাগুলোতে ফল আসার পর মুক্ত বলে বিবেচিত হবেন। রাসূল (সাঃ) নিজ হাতে সে চারাগুলো রোপণ করেন এবং ঐ বছরই সেগুলোতে ফল আসে। হযরত ওমর (রাঃ) কটিমাত্র চারা রোপণ করেছিলেন সেটিতে ফল আসল না। রাসূল (সাঃ) সেটিকে উপড়ে ফেলে পুনরায় নিজ হাতে তা রোপণ করেন, ফলে সেটিতেও ফল আসে। অপর দিকে গনীমতরূপে একটি স্বর্ণ-ডিম্ব পাওয়া গিয়েছিল। রাসূল (সাঃ) বললেন, এটি দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে ফেল। সালমান ফারসী (রাঃ) বললেন, আমার প্রয়োজন চল্লিশ আওকিয়া তথা একশ পাঁচ তোলা। এ তো যথেষ্ট হবে না। রাসূল (সাঃ) এতে স্বীয় পবিত্র রসনার স্পর্শ দিয়ে বরকতের জন্য দু'আ করেন। সালমান ফারসী (রাঃ) বলেন, আমি সেটিকে পাল্লায় ওজন দিয়ে দেখলাম যে, তা চল্লিশ আওকিয়া হতে একটুখানি কমও হল না এবং বেশীও হল না। এর বিনিময়ে মুক্তি লাভ করার পর হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) নিজেকে রাসূল (সাঃ)-এর খিতমতে উৎসর্গ করেন।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত ওমর(রাঃ) মাতা পিতার সীমাহীন আদরে লালিত পালিত হন। তাঁর বয়স দশ বছর না হতেই দেশীয় নিয়ম অনুসারে তিনি ছাগল চরানোর জন্য মাঠে নিয়োজিত হন। তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধি দেখে উট চরানোর কাজে নিয়োগ। কাদীদ নামক স্থানে সারাদিন তিনি উট চরাতেন। তাঁর পিতা সু-শিক্ষিত ছিলেন বলে তিনি পিতার কাছেই শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং সাথে সাথে তীর চালনা, কুস্তি এবং যুদ্ধ বিদ্যায়ও নৈপুণ্য অর্জন করেন। বিশ বছর বয়সে কুস্তিতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ওকাযের বার্ষিক বিখ্যাত মেলায় তিনি কুস্তি এবং প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণ করতেন। শিক্ষা দীক্ষার পাশাপাশি বংশ পরিচয়ের জ্ঞান এবং উচ্চমানের বক্তৃতা দানের ক্ষমতাও অর্জন করেন। বংশগত নিয়ম অনুযায়ী তিনি সে যুগের ব্যবসায়ে মনোযোগী হন এবং একজন সু-প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী রূপে পরিগণিত হন।

তিনি শুধু নিজের ব্যবসাকেই উজ্জ্বল এবং উন্নত করেন নাই বরং মক্কাবাসীদের বাণিজ্য এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁকে রাষ্ট্রদূত হিসাবেও কাজ করতে হত। ঝগড়া বিবাদের সময় তাঁকে বিচারক হিসাবে নিযুক্ত করা হত। তাঁর বিচার ব্যবস্থা উভয়পক্ষের জন্য গ্রহণযোগ্য হত। ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি স্বীয় জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধি-বিবেকের ফলে এমন এক খ্যাতি লাভ করেন যে, লোকের মন হতে খাত্তাব এবং নোফাইলের নাম প্রায় মুছে যায়। কুস্তির ন্যায় অশ্বারোহনেও তিনি সু-নিপুণ ছিলেন। বক্তৃতা এবং কবিতাতেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।

ইসলামের বিরোধিতা

তিনি ছিলেন জন্মসূত্রেই মূর্তিপূজক। জ্ঞান-বুদ্ধি এবং খ্যাতি ইত্যাদির বেলায় যেমন তিনি পিতার স্থলভিষিক্ত ছিলেন, মূতিপূজা এবং আল্লাহ্ দ্রোহিতায়ও তিনি পিতার উত্তরাধিকারী পেয়েছিলেন। মূর্তির প্রতি তাঁর আন্তরিকতা এবং শৈশব এবং যৌবন পর্যন্ত মূর্তির আরাধনায় জীবন অতিবাহিত করেন। হযরত যায়েদের একত্ববাদ এবং খাত্তাবের বিরোধিতা তিনি স্বচোখে অবলোকন করেছিলেন। তিনি জানতেন না যে, আল্লাহ্র নামে তাঁর ঘৃণা হচ্ছে, সে আল্লাহরই মুহব্বতে তাঁর অন্তকরণে পরিপূর্ণ হবে। রাসূল (সাঃ) যখন নবুয়তের পর ইসলামের আলো মক্কায় প্রজ্বলিত করেন, তখন হযরত তাঁর বয়স

মাত্র সাতাশ বছর। চাচাত ভাই যায়েদের কাছে যদিও তাওহীদের বাণী শুনেছিলেন কিন্তু রাসূল (সাঃ)-এর ইসলাম প্রচারে যায়েদের প্রতি তাঁর পিতা খাত্তাবের বিরোধিতার কথা স্বরণ হলে তাই তাওহীদের বাণী শোনা মাত্রই ইসলামের বিরোধিতার সকল প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। প্রথমে এ বিরোধিতা কিছুটা শিথিল ছিল। কিন্তু মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিনই বাড়তে থাকায় তিনি তা সহ্য করতে প.রলেন না তাই এর প্রতিরোধের জন্য নানান ফন্দি-ফিকির করতে লাগলেন। তিনি মামা আবু জাহলের সাথে আসন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করে একে স্তব্ধ করার সর্ব প্রকার অত্যাচার নির্যাতন গ্রহণের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। এসব ব্যাপারে সব চাইতে অগ্রগামী ছিল আবু জাহল। দু'জনের পরামর্শেই নবদীক্ষিত মুসমানদের উপর চলতে লাগল অমানুষিক নির্যাতন। লুবনিয়া নামক জনৈক দাসী ইতিমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করলে হযরত ওমর এ খবর পেয়ে দাসীকে এত মারপিট করলেন যে, তাতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পানি পান করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছিলেন। ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমান মামাভাগ্নাদ্বয়ের অত্যাচারে কিরূপ জর্জরিত হয়েছিলেন তা ভাষায় প্রকাশ্য করা একেবারেই অসম্ভব। তাদের এ বর্বরোচিত অত্যাচার দিন দিন বাড়তে থাকে তা সত্বেও মুনলামানদের সংখ্যা তত বেশী হতে থাকে। আবু জাহলের ঐকান্তিক সহযোগিতা সত্বেও ইসলামের বিরোধিতায় কাফেরবৃন্দ অকৃতকার্য হয়। এমনি এক পরিস্থিতিতে হযরত ওমর (রাঃ)-এর ঘরেই ইসলামের আলো প্রজ্বলিত হয়। তাঁর বোনও ভগ্নিপতি উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করেন কিন্তু তিনি তা মোটেই অবগত ছিলেন না।

শত্রু হল ইসলামের পরম বন্ধু

রাসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধবাদিতা মক্কার তিন ব্যক্তির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবু লাহাব, আবু জাহল এবং ওমর । তাদের অন্তরে ইসলামের বিরোধিতার আগুন সর্বদাই জ্বলতে থাকে। গরীব মুসলমানদের উপর অত্যাচার করা, মক্কার অলিগলিতে ইসলাম এবং রাসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে নানান কুৎসা প্রচার করা, মুসলমানদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা, লোভ দেখিয়ে ইসলাম হতে ফিরিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা এবং ইসলাম গ্রহণে বাধাদান করা ইত্যাদি তাদের জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্যে পরিগণিত হয়েছিল। তাঁদের এমন কিছু অত্যাচার বাকী ছিল না, যা তারা মুসলমানদের করে নাই। এখন তাদের আর

সে ধৈর্য নাই, অসহ্য হয়ে পড়েছে, তবুও মুসলমানে। ইসলাম পরিত্যাগের নাম পর্যন্ত নেয় না, এত অত্যাচারেও তারা কোন ক্রমেই পিছপা হয় না। অবশেষে একদিন তারা চরম মীমাংসার জন্য এক পরামর্শ সভার আহ্বান করল। সভায় কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্ক চলার পর সিদ্ধান্তে গৃহীত হল এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবু জাহল ঘোষণা করল- 'যে ব্যক্তি মুহাম্মদকে হত্যা করবে আমি তাকে একশত উট পুরস্কার দেব।

এ ঘোষণার সাথে সাথে হযরত ওমর তরবারী উচুঁ করে বললেন ঃ আমি এ কাজটি সমাধা করব। আপনারা অপেক্ষা করুন। আমি এখনই মুহাম্মদকে হত্যা করে আসব। এ বলেই তিনি তরবারী হাতে চলে গেলেন। মুহাম্মদ থাকবেনা এবং তাঁর ইসলামও। এ কথায় অনেকেই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন ইসলামের ভবিষ্যত নিয়ে। হযরত ওমর (রাঃ) ক্রোধের চরম সীমায় তখন উপনীত। তিনি সবেমাত্র দারে-আরকামের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, এমন সময় নাঈম নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁর সামনে উপস্থিত। ওমর (রাঃ) চেহারার ভার দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে বুঝতে পারলেন আজ নিশ্চয়ই একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এভেবে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ উমর কোন দিকে যাচ্ছেন। তিনি জবাব দিলেন, মুহাম্মদের মস্তক আনতে। একথা শোনমাত্র নাঈম রাসূল (সাঃ)-এর জীবন রক্ষার্থে ওমরের মন অন্যদিকে প্রবাহিত করার চেষ্টা করলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনি তাঁকে হত্যা করবেন কেন? ওমর বলল ঃ আজ তার আর রেহাই নেই। নাঈম বললেন, এটা সত্যিই অবিচারে পরিণত হবে? আপনি একজন বিচারক হয়ে এ কাজ কেন করবেন? ওমর বললেনঃ এটা কোনক্রমেই অবিচার হবেনা। আমি সঠিক এবং উত্তম কাজটি করতে যাচ্ছি। নাঈম এবার বললেন নিজে অপরাধ করলে অপরের বিচার করার পূর্বে নিজের বিচার করতে হয়। উমর আশ্চার্যান্বিত হল, নাঈম এবার আসল ঘটনাটি ব্যক্ত করে বললেন, আপনার বোনের খোঁজ নিয়েছেন কি? ওমর বললেনঃ তাদের আবার খোঁজ খবরের কি এমন ঘটনা ঘটল। নাঈম বললেন, আপনার বোন এবং ভগ্নিপতি যে ইতিমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছেন সে খবঁর কি আপনি রাখেন?

এ কথা শোনামাত্র ওমরের গায়ে যেন আগুন জ্বলে জ্ঞানশুন্য হয়ে বললেনঃ এরা কি সত্যিই মোহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করেছে? নাঈম বললেন ঃ হ্যাঁ। ওমর বললেন ঃ তাহলে সত্যিই আগে এদের বিচার করাই আমার উচিত।এ কথা বলেই বোনের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলেন। বোন ফাতিমা তখন কোরআনের আয়াত তিলাওয়াত করা অবস্থায় ছিলেন। তিনি ওমরের আগমন সংবাদ টের

পেয়ে তিলাওয়াত বন্ধ করলেন। আজ যে কিছু একটা অঘটন ঘটবে সে ধারণা ফাতিমা ওমরের রুক্ষ চেহারা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। ওমরের কানে সে তিলাওয়াতের শব্দও পৌঁছে ছিল। এতে নাঈমের কথায় তার বিশ্বাস সুদৃঢ় হল। তিনি প্রথমেই ভগ্নিপতি সাঈদকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারলাম তোমরা নাকি উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছ? এ কথা কি সত্যি? বলেই তিনি ভগ্নিপতিকে মারধর শুরু করলেন। ফাতিমা স্বামীকে রক্ষার্থে এগিয়ে এলে তিনিও মার খেতে লাগলেন।

এমতাবস্থায় ফাতিমা বললেন যত ইচ্ছা মারধর করুন কিন্তু কিছুতেই ইসলাম ত্যাগ করব না। আপনার যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। মারপিটের পালা তখনো শেষ হয়নি। ইতিমধ্যে ওমর কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বোনের হৃদয়বিদারক কথায় ওমরের মনে সামান্যতম পরিবর্তন দেখা দিল। ওমর বললেন, তাহলে তোমরা কি পড়ছিলে তা আমাকে একবার শোনাও। ফাতিমা ওমরের কথা শুনে সূরা ত্বা-হার প্রথম কয়েকটি আয়াত শোনালেন। শুনে ওমর বললেন বড়ই সুন্দর কালাম তোমাদের, আর একবার আমাকে শোনাও। তিনি পুনর্বার আয়াতটি শোনালে ওমরের অন্তকরণে মুহূর্তেই ইসলামের নূরে আলোকিত হল। মুহূর্তের মধ্যে এক অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে গেল। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে মুহাম্মদের কাছে নিয়ে যাও আমিও ইসলাম গ্রহণ করব। মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় শত্রু হল বন্ধুতে পরিণত। ওমরের উক্তি শোনার সাথে সাথে আত্মগোপনকারী হযরত যায়েদ আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওমরকে জড়িয়ে ধরে বললেন ঃ ওমর গতকালই রাসূল (সাঃ) দোয়া করেছিলেন যে, আল্লাহ্ ওমর অথবা আবু জাহলের মধ্যে যে কোন একজনকে ইসলাম গ্রহণের তওফীক দাও। আল্লাহ্ আপনার পক্ষেই রাসূল (সাঃ)-এর দোয়া কবুল করেছেন। ওমর দারে আরকামের দিকে এক ধ্যানের মাধ্যমে চলেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই খাত্তাবের স্থলাভিষিক্ত এবং ইসলামের ঘোরতর শত্রু মূর্তিপূজক রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হল। রাসূল (সাঃ)-এর চাচা হামযা (রাঃ) মাত্র তিন দিন হল ইসলাম গ্রহণ করেছেন। জনৈক সাহাবী ওমরের আগমন লক্ষ্য করে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বললেনঃ ওমর আসছে। হযরত হামযা (রাঃ) বললেনঃ আসতে দাও। উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয় তা হলে ভাল, নতুবা এখনই তার জীবন সাঙ্গ করে দেব। ওমর ভিতরে প্রবেশ করা

অবস্থায় রাসূল(সাঃ) তার গলায় রুমাল ধরে জিজ্ঞেস করলেন–এখানে এসেছ কি উদ্দেশ্যে। ভীতকণ্ঠে ওমর বললেন–ইসলাম গ্রহণ করতে। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল চৌত্রিশ। তিনি ছিলেন চল্লিশতম ইসলাম গ্রহণকারী। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলামানদের সাহস বেড়ে ক্বাবা ঘরে প্রকাশ্যে নামায আদায় করতে লাগলেন। যাঁরা এতদিন ইসলাম গ্রহণ করে গোপন ছিলেন এখন তাঁরা প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে লাগলেন। হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের ফলে ক্বাবা ঘরে কাফিরদের উপস্থিতিতে ইসলাম প্রকাশ্যে প্রবেশ করল। মুশরিকরা হযরত ওমর (রাঃ) এর এমন অভাবনীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করে হিংসায় জ্বলতে লাগল।

ইসলাম প্রকাশকারী প্রথম সাহাবা খাব্বাব (রাঃ)-এর ঘটনা

যিনি প্রথম ইসলাম প্রকাশকারী প্রথম সাহাবা তিনি হলেন হযরত খাব্বাব (রাঃ) ইবনে আরাত তামীরী। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, যখন শুধুমাত্র পাঁচজন এ মহান ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করেছিলেন। আর তাঁরা ছিলেন– (১) হযরত খাদীজা (রাঃ), (২) হযরত আবু বকর (রাঃ), (৩) হযরত আলী (রাঃ), (৪) হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) (৫) হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ)।

এ হিসাবে হযরত খাব্বাব (রাঃ) ছিলেন ষষ্ঠ মুসলমান। দুরবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে দাস বানিয়ে মক্কার বাজারে বিক্রি করা হয় এবং উম্মে নাসার বিন্‌তে স্যাব আল খোযারী তাঁকে খরিদ করে নেয়। তিনি মক্কায় কর্মকারের কাজ করতেন এবং তলোয়ার তৈরী করে বাজারে বিক্রি করে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতেন। তিনি যখন সত্য দ্বীনের পয়গাম শোনেন, তখন নির্দ্বিধায় তাতে তাড়া দেন এবং এভাবে তিনি প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলমান দলের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান। কিন্তু কাফেররা তাঁর প্রতি অবর্ণনীয় অত্যাচার-উৎপীড়ন চালায়। তাঁকে জ্বলন্ত কয়লার উপর শুইয়ে দিয়ে একজন বিরাট লোক তাঁর বুকের উপর চেপে বসত যাতে তিনি পাশ ফিরতে না পারেন। মদীনা মুনাওয়ারার দিনের ঘটনা। একবার আমীরুল মু'মেনীন হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে তাঁর দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করতে বললে তিনি নিজের পিঠের উপর থেকে কাপড় সরিয়ে দেখালেন। হযরত ওমর তা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁর সমস্ত পিঠে জখমের দাগে সাদা হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন, "হে আমীরুল মু'মেনীন! আগুন জ্বালিয়ে আমাকে তার উপর শুইয়ে দেয়া হত। শেষ পর্যন্ত আমার পিঠের চর্বি গলে গেলে সে

আগুন নিভে যেত।” এমনি অত্যাচার সইতে সইতে দীর্ঘ সময় কাটতে থাকলে তিনি এক সমসয় রাসূল (সাঃ)-এর কাছে নিবেদন করলেন; ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি আল্লাহ্‌র কাছে আমার জন্য দোয়া করেন না। এ কথা শুনে রাসূল (সাঃ)-এর চেহারা মোকাবরক লাল হয়ে যায়। তিনি বললেন, “তোমাদের পূর্বে অতীত যুগে এমনও লোক অতিবাহিত হয়েছেন, লোহার আঁচড়ার দ্বারা যাদের গোশত আঁচড়ে নেয়া হত। শুধুমাত্র হাড় ও রগ ছাড়া তাঁদের দেহে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। এহেন কঠোরতায় ও তাঁদের দ্বীনের আকীদাকে দোদুল্যমান করতে পারেনি। তাঁদের মস্তকে করাত চালিয়ে দেয়া হয়েছে। চিরে মাঝখান দিয়ে দু'ভাগ করে দেয়া হয়েছে, তথাপি তাঁরা দ্বীনকে পরিত্যাগ করে।

আল্লাহ্‌ এ দ্বীনকে অবশ্যই সফল করবেন। তোমরা দেখবে, এক একজন অশ্বারোহী সানআ (ইয়ামান) থেকে হাযারা মওত পর্যন্ত চলে যাবে অথচ এক আল্লাহ্‌ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না।” রাসূল (সাঃ)-এর অমীয় বাণী তাঁকে ধৈর্য ও সাহস দান করে এবং তিনি নীরবে ফিরে যান। তাঁর মালিক উম্মে নাসার লোহার দ্বারা তাঁর মাথায় দাগা দিত। একবার তিনি রাসূল (সাঃ)-এর কাছে নিবেদন করলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌, দোআ করুন, যাতে আল্লাহ্‌ তায়ালা আমাকে এ আযাব থেকে নাযযাত দান করেন।” রাসূল (সাঃ) দোআ করলেন, “আয় আল্লাহ্‌ খাব্বাবকে সাহায্য কর।” অতএব কিছুদিন পর উম্মে নাসার অসুস্থ হয়ে ছটফট করতে করতে মারা যায়। বিখ্যাত মুশরিক আস বিন ওয়ায়েলকে হযরত খাব্বাব কিছু ঋণ দিয়েছিলেন। যখন তিনি তার ঋণ পরিশোধের তাগাদা দিতেন, তখন সে বলত, “যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি মুহাম্মদ এর দ্বীন ত্যাগ না করবে তখন পর্যন্ত কিছুই দেব না।” তিনি বলতেন, “যে পর্যন্ত তুমি পূনর্জন্ম নিয়ে এ দুনিয়ায় ফিরে না আসবে আমি খাব্বাব মুহাম্মদ (সাঃ) -এর হাত ছাড়ব না।” “তাহলে অপেক্ষা কর, আমি যখন পুনর্জীবিত হয়ে আসব এবং আমার সন্তানও সম্পদের উপর উপর অধিকার লাভ করাব, তখনই তোমার ঋণ চুকিয়ে দেব।”

তিনি যখন মক্কা থেকে মদীনা অভিমুখে হিজরত করেন, তখন কাফেররা তাঁর যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি ছিনিয়ে নেয় এবং ঋণ পরিশোধ করতে অস্বীকার করে বসে। তিনি সে খাব্বাব যিনি রাসূল (সাঃ)-এর সময় সংঘটিত সমস্ত জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি স্থায়ীভাবে কুফায় বসতি স্থাপন

করেন। সেখানেই ৩৭ হিজরীতে কঠিন পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর সময় তিনি ওসীয়ত করেছিলেন যাতে তাঁকে শহরের বাইরে সমাহিত করা হয়। তিনি প্রাথমিক যুগেই কুরআন মজীদ পড়া শিক্ষা করেছিলেন। হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে তাঁর আলোচনা আসে। তিনি হযরত ওমর (রাঃ) এর বোন ও ভগ্নিপতিকে কুরআন পড়াতেন। হযরত খাব্বাব অত্যন্ত কোমলহৃদয় ও বিনয়ী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ৩৩টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত আম্মার (রাঃ) এবং তাঁর পিতা-মাতার কাহিনী

কাফেরদের হাতে অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করেছিলেন হযরত আম্মার. (রাঃ) এবং তাঁর পিতা-মাতা। উত্তপ্ত মরুর বালি উপর শুইয়ে রেখে তাঁকে নির্যাতন করা হত। তার এ অবস্থা দেখে রাসূল (সাঃ) তাঁকে সবর করতে বলতেন এবং বেহেশতের সুসংবাদ দিয়ে তাকে সান্ত্বনা প্রদান করতেন। তাঁর পিতা হযরত ইয়াহিয়া কাফেরদের নির্যাতনে প্রাণত্যাগ করেন এবং তাঁর মাতা হযরত সুমাইয়া অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এত নির্যাতন সত্ত্বেও তাঁরা তওহীদের বাণী কখনও ভুলে ইসলাম পরিত্যাগ করে নিজের সুখশান্তির কথা স্বপ্নেও চিন্তা করেননি। হযরত সুমাইয়া ছিলেন ইসলামের প্রথম শহীদ এবং হযরত আম্মার ইসলামের প্রথম মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা। রাসূল (সাঃ) যখন মদীনায় হিজরত করতে যান তখন আম্মার একদিন রাসূল (সাঃ)-কে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনার জন্যে একটা ছায়াযুক্ত স্থান তৈয়ার করা উচিত যেখানে আপনি রোদের সময় বিশ্রাম ও নামায আদায় করতে পারবো। এ কথার পর হযরত আম্মার (রাঃ) নিজেই কুবা নামক একটি পল্লীতে প্রথম মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। হযরত আম্মার (রাঃ) অত্যন্ত আগ্রহের সাথে জিহাদের যোগদান করতেন। একবার তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে বলেন, এখন আমি বন্ধুদের সাথে এবং রাসূল (সাঃ) ও তাঁর জামাতের সাথে মিলিত হব। একথা বলার সাথে সাথে তাঁর তীব্র পিপাসা হলে পানির আবেদন জানালে এক ব্যক্তি তাঁকে দুধ এনে দিলে তিনি তা পান করে বললেন, আমি রাসূল (সাঃ)-এর কাছে শুনেছি যে, তুমি দুনিয়াতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগে দুধ পান করবে। এ কথাই বলেই তিনি অনন্তের পথে পা বাড়ালেন। চৌরানব্বই বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। -(উসদুল গাবা)

হযরত সোয়ায়েব (রাঃ)-এর ঘটনা

একত্রে হযরত শোয়ায়েব ও হযরত আম্মার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারা পৃথক পৃথক ভাবে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হলে উভয়েরই সাক্ষাত হল। দু'জনের কথাবার্তায় জানা যায় যে তাঁদের দুজনের উদ্দেশ্য একই। তাঁরা রাসূল (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করে ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকেই তাঁদের উপর চলতে থাকে লোমহর্ষক অত্যাচার। অবশেষে বাধ্য হয়ে তাঁরা হিজরত করলে এটিও কাফেরদের মনঃপুত হল না। নবদীক্ষিত মুসলমানদের হিজরতের সংবাদ পেলেই কাফেররা কঠোরতম শাস্তি প্রদান করত। কাফেররা হযরত শোয়ায়েবের হিজরতের কথা জানতে পেরে একদল কাফের তাকে ধরতে যায়। তিনি তখন তীর বের করে বলেন, তোমরা নিশ্চয়ই অবগত যে, আমি তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ, আমার হাতে একটি তীর থাকা পর্যন্ত তোমাদের কেউ আমার কাছে আসতে পারবে না। তীর শেষ হলে তরবারীর সাহায্য নেব এবং যতক্ষণ তরবারী হাতে থাকবে ততক্ষণ কেহই অমার কাছে আসতে পারবে না। তারপরও যদি তরবারীটি কোনক্রমে আমার হাতছাড়া হয়, তখন তোমরা আমাকে যা খুশি করতে পার। সেজন্যেই বলছি, যদি তোমরা আমার প্রাণের বিনিময়ে আমার সম্পদ গ্রহণ কর তাহলে তোমাদেরকে আমার সম্পদের সন্ধান দিতে পারি। মক্কাতে সম্পদসহ আমার দু'টি দাসীও রয়েছে। তাদেরকেও তোমরা নিয়ে যেতে পার। এ প্রস্তাবে কাফেররা সম্মত হলে হযরত সোয়ায়েব (রাঃ) নিজের সম্পদ দিয়ে নিজেকে মুক্ত করলেন। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, "এমন লোকও রয়েছে যারা আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্যে নিজের প্রাণ খরিদ করে নেয় এবং আল্লাহ্ নিজের বান্দাদের উপর সর্বদাই দয়াশীল।"–(সূরা বাকারা ঃ ২০৭; দুররে মানসুর)। রাসূল (সাঃ) কুবা পল্লীতে অবস্থানকালে হযরত সোহায়েবের অবস্থা বিবেচনা করে তিনি বললেন, বড় লাভজনক ব্যবসাই করলে সোয়ায়েব। হযরত সোয়ায়েব (রাঃ) বললেন, রাসূল (সাঃ) তখন খেজুর খাচ্ছিলেন এবং আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। তা দেখে আমিও তাঁর সাথে খেতে বসলাম। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, চোখের রোগে ভুগছ আবার খেজুরও খাচ্ছ? হযরত সোয়ায়েব বললেন, রাসূল (সাঃ) যে চোখটি ভাল আছে তা দিয়েই দেখে খাচ্ছি। তাঁর উত্তর শুনে রাসূল (সাঃ) একটু মুচকি হাসলেন। হযরত সোয়ায়েব খুব অমিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি এত অধিক খরচ করতেন যে, একদিন হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে বলেন তুমি অনর্থক খরচ কর।

তখন তিনি উত্তর দিলেন আমি অন্যায়ভাবে কিছুই খরচ করি না। হযরত ওমর (রাঃ)-এর মৃত্যুর আগে অসিয়ত করেছিলেন হযরত সোয়ায়েবকে তাঁর জানাযার পড়াবার জন্য। –(উসদুল গাবা)

সাহাবাদের হাবশায় হিযরত

হযরত রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবাবৃন্দের উপর কাফিরদের চরম নির্যাতন ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকলে তখন রাসূল আকরাম (সাঃ) তাদেরকে মক্কা ত্যাগ করার নির্দেশ প্রদান করলেন। সে মোতাবেক অনেক সাহাবী আফ্রিকার হাবশ (ইথিওপিয়া) দেশে হিযরত করলেন। হাবশ দেশের বাদশাহ ছিলেন খ্রীষ্টান। তিনি ন্যায়-পরায়ণতার জন্যে অত্যন্ত সু-প্রসিদ্ধ ছিলেন। সে জন্যে নবুয়তের পঞ্চম বছরে রযব মাসে এগার বারজন পুরুষ ও চার-পাঁচজন স্ত্রীলোকসহ একদল মুসলমান সর্বপ্রথম হাবশে হিযরত করেন। মক্কাবাসীরা তাঁদেরকে ফেরত আনার জন্যে চেষ্টা করে অকৃতকার্য হয়। মুসলমানরা সেখানে পৌঁছে সংবাদ পেলেন যে, মক্কাবাসীদের সকলেই মুসলমান হয়ে গেছেন। এটা ছিল নিতান্তই একটা গোযব। তাই তাঁরা মক্কায় ফিরে যাবার জন্যে রওয়ানা হলেন। কিন্তু মক্কার নিকটবর্তী হয়ে তাঁরা জানতে পারলেন যে, সংবাদটি কাফেরদের মিথ্যা প্ররোচনা। কাফিরদের ইসলাম গ্রহণ তো দুরের কথা বরং মুসলমানদের উপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বহু গুণে বৃদ্ধি করেছে। এ সংবাদ পেয়ে সাহাবীদের কেহ কেহ পুনরায় হাবশে চলে যান আবার কেহ কেহ নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের সহায়তায় মক্কায় ফিরে আসেন।

এটিই ছিল মুসলমানদের প্রথম হিযরত। এরপর ৮৩ জন পুরুষ ও ১৮ জন মহিলা বিভিন্ন পথে হাবশ দেশে হিযরত করেন। এটি ছিল হাবশে মুসলমানদের দ্বিতীয় হিযরতের ঘটনা। কাফেররা যখন দেখল যে মুসলমানরা হাবশ দেশে বেশ সুখে-শান্তিতে রয়েছে তখন তাদের হিংসা আরও বেড়ে গেল। সাহাবীদের এ শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন তাদের সহ্য হলনা। তারা অনেক মূল্যবান উপঢোকনসহ একদল দূত বাদশাহ্ নজ্জাশীর দরবারে পাঠিয়ে দিল। তারা সেখানে পৌঁছে তারা প্রথমে নাজুসীর বিশিষ্ট পাদ্রীদেরকে হাত করবার জন্যে অনেক দ্রব্যসামগ্রী দান করল। পাদ্রীরা তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে কথা দিয়েছিল যে, তারা নাজাশীর কাছে কোরাইশ দূতদের পক্ষে সুপারিশ করবে। এরপর কুরাইশ দূতগণ অতি মূল্যবান দ্রব্যাদি নিয়ে বাদশাহের দরবারে হাযির হল। দরবারে প্রবেশ করে তারা প্রথমে বাদশাহকে সিজদা করে তারপর উপঢৌকনাদি তাঁর সামনে উপস্থাপন করে নিজেদের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল। তারা

নিবেদন করল, হে রাজাধিরাজ! আমাদের গোত্রের কিছু লোক নিজেদের সনাতন ধর্মত্যাগ করে একটা নুতন ধর্ম গ্রহণ করেছে। এ ধর্ম সম্বন্ধে আমরাও কিছু জানিনা আমাদের বাপ-দাদারাও কিছু জানেন না। এরা ধর্মান্তরিত হয়ে আপনার দেশে পালিয়ে এসে নিশ্চিন্তে বসবাস করছে। তাদের ফিরিয়ে দেয়ার জন্য মক্কার নেতারা এবং এসর যুবকদের আত্মীয়-স্বজন আমাদেরকে আপনার দরবারে পাঠিয়েছেন। দয়া করে তাদেরকে আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিন। তাদের কথা শুনে বাদশাহ্ বললেন, যারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদের সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত না হয়ে তাদেরকে কারো হাতে সমর্পণ করা যাবে না। তাদের বক্তব্য শুনে যদি বুঝি যে, তোমাদের অভিযোগ সত্য তাহলে তাদেরকে নিশ্চয়ই তোমাদের হাতে সমর্পণ করব। বাদশাহর এ কথা শুনে তথাকার মুসলমানরা প্রথমে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদের অন্তরে শক্তি ও সাহস সঞ্চার করে দিলেন। তাঁরা ঠিক করলেন যে, তারা সত্য কথাগুলোই নির্ভিককণ্ঠে বাদশাহর দরবারে পেশ করবেন। দরবারে উপস্থিত হয়ে সাহাবীগণ প্রথমে ইসলামী রীতি অনুযায়ী সকলকে সালাম জানালেন। এতে কোন এক রাজপরিষদ আপত্তি করে প্রশ্ন করলেন, তোমরা বাদশাহ্র সম্মানসূচক সিজদা করলে না কেন? তাঁরা উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকেও সিজদা করার জন্যে আমাদের রাসূল আমাদেরকে হুকুম দেননি। এরপর নাজ্জাশী মুললমানদের বক্তব্য শুনতে চাইলেন। তখন হযরত যাফর (রাঃ) বলতে লাগলেন, আমরা অজ্ঞান ছিলাম। সত্যিকার জ্ঞান আমাদের কিছুই ছিল না। কে আল্লাহ্, কে তাঁর রসূল, আমরা কিছুই জানতাম না। আমরা পাথরের পূজা করতাম। মৃত জীব ভক্ষণ করতাম, আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করতাম। আমরা সবলেরা দুর্বলকে হত্যা করতাম এবং নানাবিধ অনাচার, ব্যভিচারে লিপ্ত ছিলাম। আমরা যখন নৈতিক অবনতির অতল গহ্বরে তলিয়ে গেলাম তখন আল্লাহ্ আমাদের কাছে তার রাসূল পাঠালেন। তাঁকে আমরা খুব ভাল করে চিনি। তাঁর বংশাবলী, তাঁর সততা, তাঁর চরিত্র ও আমানতদারী আমাদের কাছে সুপরিচিত। তিনি আমাদের এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্র উপাসনা করতে আদেশ দেন এবং অসৎ কাজ হতে বিরত থাকতে আমাদেরকে বলেন। তিনি আমাদের সত্য কথা বলতে, আমানত রক্ষা করতে এবং সকলের সাথে সৎভাবে থাকতে আদেশ দিয়েছেন। পাড়া-পড়শীর সাথে মিলেমিশে থাকাই তাঁর হুকুম। তিনি আমাদের নামায কায়েম করতে, রোযা রাখতে এবং দান-খয়রাত করতে আদেশ দিয়েছেন। আমাদেরকে দুর্নীতি, ব্যভিচার, এতিমের

মাল হরণ, কারো উপর মিথ্যা দোষারূপ করা থেকে বিরত থাকতে হুকুম করেছেন। আমাদের রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে পবিত্র কোরআন শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ্র মধুর বাণী শুনিয়ে আমাদের মধ্যে নব জীবনের সঞ্চার করেছেন। আমরা তাঁকে আল্লাহ্র সত্য রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করেছি এবং তাঁর সমস্ত বিধি নিষেধ মাথা পেতে মেনে নিয়েছি। এজন্যেই আমাদের গোত্রের লোকেরা আমাদের মহাশত্রুতে পরিণত হয়েছে এবং আমাদের উপর অত্যন্ত নির্মমভাবে নির্যাতন করছে। তাদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দেশ ছেড়ে আপনার দেশে আশ্রয় নিয়েছি। আমরা আমাদের রাসূলের আদেশক্রমে এখানে এসে হাযির হয়েছি। নাজ্জাশী বললেন, তোমাদের রাসূল (সাঃ) যে কোরআন নিয়ে এসেছেন তার খানিকটা আমাকে শোনাও, হযরত যাফর 'মরিয়ম' নামক সূরার প্রথম কয়েকটি আয়াত পাঠ করলেন। তা শুনে বাদশাহ্ কাঁদলেন এবং তার পাদ্রীরাও এত বেশী পরিমাণে কাঁদলেন যে তাদের দাঁড়ি বেয়ে অশ্রু ঝরতে শুরু করল।

তারপর বাদশাহ বললেন, আল্লাহ্র কসম, যে বাণী হযরত মূসা (আঃ) নিয়ে এসেছিলেন তা একই নূর হতে এসেছে। এ কথা বলেই তিনি কোরাইশ দূতগণকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, মুসলমান মুজাহিদগণকে তাদের হাতে সমর্পণ করা হবে না। বাদশাহর কথায় তারা অত্যন্ত চিন্তিত ও অপমানিত হল। তাদের নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে বলল, আগামীকাল এমন কৌশল অবলম্বন করব, যাতে বাদশাহ এ সকল পলাতক হতভাগাদের শিকড় পর্যন্ত কেটে দিতে বাধ্য হন। এ কথায় চিন্তিত হয়ে একজন বলে উঠল না! এমন কিছু করতে যেওনা। হাজার হোক তারা আমাদের আত্মীয়-স্বজন। মুসলমান হয়েছে বলেই তাদেরকে কোনরূপ চরম শাস্তি দেয়া উচিত হবে না। কিন্তু লোকটির কথা তারা মানল না। তার, অব্যর্থ কৌশলটি খাটাবে বলে দৃঢ়সংকল্প হল। পরদিন এ তারা বাদশাহর দরবারে হাযির হয়ে অভিযোগ করল যে, মুসলমানেরা হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে অত্যন্ত ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা বলে থাকে এবং তাকে আল্লাহ্র পুত্র বলে স্বীকার করে না। নাজ্জাশী মুসলমানদেরকে পুনরায় দরবারে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা উপস্থিত হলে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে কি বলে থাক?

তাঁরা উত্তর দিলেন, আমরা ঠিক তাই বলে থাকি যা হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে আমাদের রাসূলের নিকট নাযিল হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁরই রাসূল; তিনি রুহুল্লাহ; আল্লাহ্ তাঁকে কুমারী এবং পবিত্র

মরিয়মের গর্ভে সৃষ্টি করেছেন। বাদশাহ বললেন, হযরত ঈসা ও তাঁর নিজের সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশী বলতেন না। তাঁর কথা শুনে পাদ্রীরা একটু আপত্তি করলেন। কিন্তু তিনি তাদের কথায় কর্ণপাত না করে মুসলমানদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা আমার এখানে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ। তোমরা এখানে সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে যাক। যারা তোমাদের নির্যাতন করেছে তাদেরকে নিশ্চয়ই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ ক্ষতিপূরণর কথা তিনি দরবারে ঘোষণা করে কোরাইশদের সমস্ত উপঢৌকন ফিরিয়ে দিলেন। -(খামীস)।

নাজ্জাশীর দয়া এবং ন্যায়পরায়ণতায় মুসলমানেরা হাবশে খুব আরাম-আয়েশে বসবাস করতে লাগলেন। এরপর কোরাইশ দূতগূণ অতি লজ্জিত ও অপমানিত হয়ে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হল। দূতগণের ব্যর্থতায় কোরাইশগণ ক্রোধে দ্বিগুণ জ্বলে উঠল। তারা একেবারে উম্মদ হয়ে মুসলমানদের উপর নির্মম অত্যাচার চালাতে লাগল। মুসলমানরা বাইরে যেতে পারে না। কাফেররা দেখলেই তাঁদের উপর নৃশংস মারপিট চালাত। কিন্তু এ অত্যাচার নির্যাতনের পরেও যখন মুসলমানদের সংখ্যা ধীরে ধীর বেড়ে চলল তখন কোরাইশরা সভা করে ঠিক করল যে তারা মুসলমানদেরকে বয়কট করে সমস্ত যোগাযোগ, সম্বন্ধ, আদান-প্রদান, লেন-দেন, কাজ-কারবার এমনকি কথাবার্তা পর্যন্ত বন্ধ করে দেবে। শুধু মুসলমানদের সাথেই নয় বরং বনি হাশেম ও বনি মোত্তালেব গোত্রের সমস্ত অমুসলমানদের সাথেও এ বয়কট করার জন্যে তারা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হল। এ সিদ্ধান্ত শুধু কথায়ই শেষ হল না। বরং নবুয়তের সাত বছরে মহরমের এগার তারিখে একে লিপিবদ্ধ করে কাবা গৃহে টানিয়ে রাখা হল। স্থির হল যে, যে পর্যন্ত মুহাম্মদকে হত্যা করার জন্যে তাদের হাওলা করানো না হবে, সে পর্যন্ত এ প্রতিজ্ঞা পত্র বলবত থাকবে। এ বয়কটের ফলে রাসূল (সাঃ) তাঁর পরিবার, পরিজন ও সাহাবীগণ দীর্ঘ তিনটি বছর দু'পর্বতের মধ্যবর্তী এক উপত্যকায় বর্ণনাতীত কষ্ট ভোগ করেছিলেন। এ সময়ে তাঁরা কারাগারের বন্দীর তুলনায় পতিত হয়েছিলেন। বাইরের কোন লোকের সাথে দেখা সাক্ষাত করা তখন তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেহই তাঁদের নিকট আসত না। তাঁরা কারও নিকট যেতেন না। নিজের ঘাঁটি ছেড়ে কেহ বাইরে গেলেই আর নিস্তার ছিল না। কাফিররা তাঁকে নির্মমভাবে প্রহার করত। কিছুদিন এভাবে অতিবাহিত হবার পর মুসলমানদের অবস্থা অতি শোচনীয় হয়ে উঠল। কারণ তাঁদের সাথে যে পরিমাণ খাদ্য-সামগ্রী মওজুদ ছিল তা কিছুদিনের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল এবং এর ফলে তাঁরা নিদারুণ অন্নকষ্টে পতিত হলেন।

খাদ্যাভাবে উপবাস আরম্ভ হল, শিশু এবং স্ত্রীলোকেরা অনবরতঃ অনশনের ফলে বেহুশ হয়ে চীৎকার করতে লাগলেন। গাছের পাতা খেতে খেতে সকলের পায়খানা ছাগল-বকরীর বিষ্ঠার ন্যায় কঠিন হয়ে গেল। শিশুদের ক্রন্দনে বয়স্কদের হুশ জ্ঞান লোপ পাবার উপক্রম হল। এমনি অমানুষিকভাবে নির্যাতীত হলেও সাহাবীগণ সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করে তারা স্বধর্মে অটল রইলেন। এ সকল সাহাবীদের প্রদর্শিত ধর্ম ও আদর্শের আমানতদার বলে আমরা নিজেদের দাবি করি। কিন্তু উভয়ের মাঝে পার্থক্য যে কত তা কোনদিন চিন্তা করে দেখি কি? মনে করি যে, সাহাবীগণের মত আমরাও ধর্মের যথেষ্ট উন্নতি করে যাচ্ছি। কিন্তু তাঁদের ত্যাগের সাথে আমাদের ত্যাগের তুলনা হয় কি?

মুহাজির ও আনসার বাহিনীর সম্মিলিত প্রথম যুদ্ধাভিযান

গযওয়ায়ে বদর ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম যুদ্ধাভিযান যাতে মহাজির ও আনসারহণ সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করেন।

(১) ২রা হিজরীর রমযান মাসে এ যুদ্ধ সংগঠিত হয় এতে তিনজন বিশিষ্ট মুসলিম যোদ্ধা ছিলেন হযরত আলী (রাঃ) হযরত হামযা (রাঃ) এবং হযরত ওবাইদা (রাঃ) ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মত্তালিব।

(২) এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষের সর্বপ্রথম নিহত ব্যক্তি ছিল আসওয়াদ ইবনে আসাদ। মুসলমানদের পক্ষে সর্বপ্রথম শাহাদত বরণ করেন হযরত ওমর (রাঃ) ইবনে খাত্তাবের মওলা (চুক্তিবদ্ধ গোলাম) হযরত মাহযা (রাঃ)

(৩) এ যুদ্ধে জয়ের সুসংবাদ মদীনায় প্রথম নিয়ে এসেছিলেন হযরত যায়েদ (রাঃ) ইবনে হারেসা।

এর বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ২য় হিজরীর রমযান মাসে রাসূল (সাঃ) ৩১৩ জন মুজাহেদীন মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা হয়ে যাফরানে পৌঁছেন এবং বিভিন্ন সূত্রে মক্কার কোরায়েশ বাহিনীর খবরাখবর সংগ্রহ করার পর তিনি সাহাবায়ে কিরামের উদ্দেশ্যে বলেন-"এগিয়ে চল এবং আনন্দিত হও। আল্লাহ্ তা'আলা আমার সাথে দু'দলের মধ্যে একটির ওয়াদা করেছেন। আর বলতে গেলে আমি যেন কোরায়েশদের পরাজয়ের জায়গাটি নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি।" কোরায়েশদের একহাজার বাহিনী পরিপূর্ণ যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে আট দিনে বদরে এসে পৌঁছেছিল। তাদের বাণিজ্যকাফেলা মুসলামানদের উপস্থিতির কথা জানতে পেরে পথবদলে মক্কায় গিয়ে পৌঁছেছিল এবং তাদের আর্তচিৎকারে

এ কাফের বাহিনী মুসলমানদেরকে চিরতরে ভূপৃষ্ঠ থেকে মুছে দেয়ার প্রত্যয় নিয়ে বদরে এসে উপনীত হয়েছিল। উভয় বাহিনী সামনাসামনি হলে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়।

সুতরাং ২য় হিজরীর ১৭ই রমযান জুমাবার যুদ্ধ শুরু হয়। রাসূল (সাঃ) যুদ্ধের ময়দানে এক পাশে অবস্থিত নিজের তাবুতে বসে আল্লাহ্র দরবারে মুনাজাত করছেন। পূর্বের রাতেও তিনি বিগলিত কণ্ঠে দোআ করেছেন ঃ "হে আল্লাহ্ এরা কোরায়েশ। এরা নিজেদের দম্ভ ও অহঙ্কারের নেশায় মত্ত হয়ে তোমার বান্দাদেরকে তোমার আনুগত্য ও উপসনা থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্য এবং তোমার রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মানসে এগিয়ে এসেছে। সুতরাং তুমি সে সাহায্য পাঠাও যার ওয়াদা তুমি আমার সাথে করেছ। হে আল্লাহ্, তুমি এদেরকে ধ্বংসের মুখে পতিত কর। আজকের দিনে মুসলমানদের এ ক'টি প্রাণ যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তোমার ইবাদত হয়ত আর হবে না।" অতঃপর আরব রীতি মোতাবেক একক মোকাবেলার উদ্দেশ্য মক্কার মুশকিদের পক্ষে তিন বীর শায়বাহ, তার ভাই উতবাহ এবং তার পুত্র ওলীদ হাঁক ছাড়তে ছাড়তে যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসে হাযির হয়ে মুসলমানদেকে তাদের মোকাবেলা করার আমন্ত্রন জানায়। রাসূল (সা) নিজের সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ হযরত হামযা (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ওবায়দা (রাঃ) ইবনে হারেসকে তাদের মোকাবেলার জন্যে পাঠিয়ে দেন।

সাথে সাথেই লোহার সাথে ইস্পাতের সংঘর্ষ বেধে যায় । কিন্তু কাফের বাহিনী দেখতে পায় , তাদের মহবীরত্রয় রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে। অপর দিকে হযরত ওবায়দা (রাঃ) কঠিনভাবে আহত হলে মুসলমানরা তাঁকে নিজেদের শিবিরে পৌছে দেন। মুসলমানদের পক্ষে সর্বপ্রথম শাহাদত বরণ করেন হযরত ওমর (রাঃ), ইবনে খাত্তাবের মুক্ত গোলাম মাহজা' (রাঃ)। তাঁর শাহাদাত সম্পর্কে দুটি বর্ণনা রয়েছে। ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ বলেন, যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি নিজেদের ব্যূহ থেকে বেরিয়ে গিয়ে শত্রুকে চ্যালেঞ্জ্য করলে এক মুশরিক বীর আমের ইবনে হাদরামী তাঁর মোকাবেরা করতে আসে এবং তিনি বীরের মত যুদ্ধ করতে করতে তারই হাতে শাহাদত বরণ করেন।

অন্য আরেক বর্ণনা মতে হযরত মাহজা' মুশরিকদের সাথে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত অবস্থা হঠাৎ করে শত্রুপক্ষের একটি তীর তাঁর দেহে বিদ্ধ হলে তিনি শাহাদত বরণ করেন। তিনিই ছিলেন বদর যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে প্রথম

শহীদ। তিনি ছিলেন ইয়ামনের অধিবাস। একবার তাঁদের গায়ে ডাকাত পড়ে এবং তাঁকে ধরে নিয়ে বিক্রি করে দেয়। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে কিনে মুক্ত করেন তাঁকে। তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। বদরের এ যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ভোরবেলায়, কিন্তু দুপুর পর্যন্ত যুদ্ধের রূপ সম্পূর্ণভাবে বদলে গিয়েছিল। কোরায়েশ বাহিনী নিজেদের ৭০ জন নিহত সৈনিকের লাশ ফেলে রেখে মক্কার দিকে পালিয়ে যায়।

পক্ষান্তরে মুসলমানরা তখনো বিজয়ী বেশে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থান করছিলেন। তাঁদের হাতে ছিল বিপুল পরিমাণ গণীমতসামগ্রী এবং ৭০ জন যুদ্ধবন্দী। মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ছয়জন মুহাজির ও আটজন আনসার শাহাদত বরণ করেন। রাসূল (সাঃ) তাঁদের দাফন-কাফন সম্পন্ন করার পর নিহত কাফেরদেরকে একটি গর্তে পুতে দেন। এ বিজয় সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেন, "সমস্ত প্রশংসা ও শুকরিয়া আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। তিনি তাঁর বিজয়ের অঙ্গীকার বাস্তবায়িত করেছেন, নিজের বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং বিপক্ষীয় সমস্ত বাহিনীকে সে একক সত্তাই পরাজিত করেছেন।" রাসূল (সাঃ) এ মহাবিজয়ের সুসংবাদ শোনানোর জন্য হযরত যায়েদ (রাঃ) ইবনে হারেসা ও হযরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ) ইবনে রাওয়াহাকে মদীনায় পাঠান। ফলে হযরত যায়েদ (রাঃ) ইব্নে হারেসা ছিলেন প্রথম এ সুসংবাদবহনের গৌরবের অধিকারী। বদর যুদ্ধে যে কয়জন সাহাবী প্রথম একক পর্যায়ের যুদ্ধে মোকাবেলা করেন তাঁদের মধ্যে ওবায়দা (রাঃ) ইবনে হারেস ছিলেন রাসূল (সাঃ)-এর চাচা। তিনি রাসূল (সাঃ) চাইতে ১০ বছরের বড় ছিলেন। তিনি মুসলমানদের দারে আরকামে সমবেত হওয়ার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং পরে দারে আরকামে সমবেতদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছিলেন। শিয়াবে আবু তালেবের কঠিন দিনগুলোতেও তিনি রাসূল (সাঃ)এর সাথে ছিলেন। হিযরতের সময় তাঁর বয়স ছিল ৬০ বছর। তাই তাঁকে বলা হত শায়খুল মুহাজেরীন অর্থাৎ সর্বাধিক বয়স্ক মুহাজির। তাঁকে রাসূল (সাঃ) যথেষ্ট মূল্যায়ন করতেন। রাসূল (সাঃ) কাফেরদের গতি-বিধির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য তাঁকে প্রথম হিজরীতে ৬০/৭০ জন অশ্বারোহী দলের নেতা নিযুক্ত করেন। এ অভিযানকেই বলা হয় সারিয়্যা ইবনে হারস বা সারিয়্যাহ রাবেগ। এ অভিযানেই হযরত সা'দ ইবনে আবী ওক্কাস (রাঃ) শত্রু বাহিনীর উপর ইসলামী ইতিহাসের সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেন। বদর যুদ্ধে আহত হয়ে মদীনা প্রত্যাবর্তনের সাথে সাফরা নামক উপত্যকায় তিনি শেষ

নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন। কথিত আছে, তাঁকে সমাহিত করার পর থেকে দীর্ঘকাল ধরে সাফরার আবহাওয়া কস্তুরির সুগন্ধ ছড়াতে থাকে। শাহাদাতকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবায় প্রথম বাইয়াত গ্রহণকারী সাহাবা

আইয়ামে তশরীকের শেষ দিন। রাতের বেলায় রাসূল (সাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ) সমভিব্যবহারে আকাবায় আগমন করেন। এখানে মদীনার সমস্ত সত্যপন্থী মুশরিকদের কাছ থেকে একজন বললেন- আপনি আপনার নিজের ব্যাপারে আমাদের কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নিতে চান, নিয়ে নিন। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন-"আমি তোমাদের কাছ থেকে এ বিষয়ে বাইয়াত (অঙ্গীকার) নিচ্ছি যে, তোমরা এমনভাবে আমার সমর্থন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকবে, যেমন করে স্বয়ং নিজের পরিবার-পরিজনকে করে থাক।" ইমাম আহমদ (রহঃ) ও ইমাম বাইহাকী (রহঃ) লিখেছেন- রাসূল (সাঃ)-এর বক্তব্য শুনে হযরত বাররা (রাঃ) ইবনে মা'রূর তাঁর পবিত্র হাত নিজের হাতে ধরে নিবেদন করলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহকারে পাঠিয়েছেন, আমরা আমাদের প্রাণ সন্তান-সন্তুতির মতই আপনার হিফাযত করব। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনি আমাদের কাছ থেকে বাইআত নিয়ে নিন। আমা যুদ্ধ পরীক্ষিত লোক। আর এটা আমরা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।"

ওয়াকেদী (রহঃ) বর্ণিত এক রেওয়ায়াতে এ প্রসঙ্গে হযরত বাররা (রাঃ) ইবনে মা'রূরের ভাষ্য উদ্ধৃত করেছেন এভাবে-"আমরা প্রচুর সমরোপকরণ ও ক্ষমতা সংরক্ষণ করে রেখেছি। অথচ আমাদের এ অবস্থা তখন ছিল যখন আমরা মূর্তি উপাসক ছিলাম। সুতরাং যখন আমাদেরকে আল্লাহ্ হিদায়াত দান করেছেন, তখন আমাদের অবস্থা কেমন হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। অন্যরা হিদায়তের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। আর আল্লাহ্ যখন মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে আমাদের সমর্থন করেছেন।" ইবনে সা'দের বর্ণনা মতে বাইআতে আকবা উপলক্ষ্যে হযরত বাররা (রাঃ) একথাও বলেছিলেন যে, "হে আব্বাস, আমরা আপনার বক্তব্য শুনেছি। (আপনি জানতে চেয়েছেন, আমাদের মাঝে সমগ্র আবের বিরোধীতার মোকাবেলা করার ক্ষমতা আছে কি-না?) আল্লাহ্‌র কসম, আমাদের অন্তরে যদি অন্য কোন কিছু গোপন থাকত, তাহলে আমরা তা সুস্পষ্ট বলে দিতাম। আমরা তো রাসূল (সাঃ)-এর সাথে সত্যিকারভাবে আনুগত্য করার জন্য জানের বাজী লাগিয়ে দিতে চাই।"

তাঁরপর মদীনার অন্যান্য সত্যপন্থীরা রাসূল (সাঃ)-এর বাইআত গ্রহণ করেন। ইতিহাসে এ বাইয়াতকে আকাবায়ে কবীরা কিংবা লাইলাতুল আকাবা নামে অভিহিত করা হয়। তিনি দ্বিতীয় বাইআতে আকাবায় নিযুক্ত খাযরাজের ৯জন নাকীবের একজন ছিলেন যাদেরকে বনু সালামাহর নাকীব নির্বাচিত করা হয়। এ বাইআতের পর রাসূল (সাঃ) হিযরতের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। কিন্তু হযরত বাররা ইব্‌নে মা'রূর (রাঃ) তা দেখে যেতে পারেননি। রাসূল (সাঃ) হিযরতের একমাস পূর্বে রোগাক্রান্ত হয়ে তিনি পরলোকগমন করেন। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীদের মধ্যে গণ্য হন। তিনি যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ঈমানী বলিষ্ঠতা দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবায় প্রদর্শন করেছিলেন তার দৃষ্টান্ত বিরল। তাঁকে মুত্তাকী বিজ্ঞ ও ফকীহ খেতাবেও ভূষিত করা হয়।

মুসলিম পিতামাতার কোলে প্রতিপালিত প্রথম নারী

যিনি প্রথম মুসলিম পিতা মাতার কোলে প্রতিপালিত হন তিনি হলেন উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা বিনতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)। জন্মের পর থেকেই তিনি নিজের পিতামাতাকে মুসলমান দেখতে পান। রাসূল (সাঃ)-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয় ইসলামের আবির্ভাবের দশম সনের শাওয়াল মাসে। তখন তাঁর বয়স ছিল ৯ বছর। ১ম হিজরী সনের শাওয়াল মাসে মদীনায়ে মুনাওয়ারায়ে তাঁর রুখসাতী হয়।

তিনি ছিলেন এমন মহিলা–

(১) যিনি সমগ্র নারীসমাজে এমন ফযীলতের অধিকারিনী যেমন খাবারের মধ্যে সারীদ (উন্নত মানের গোশত মিশ্রিত একপ্রকার খাবার)।

(২) যাঁর লেহাফের ভেতরেও রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি ওহী নাযিল হয়। অন্য কোন আযওয়াজে মুতাহহারাতের এ গৌরব অর্জিত হয়নি।

(৩) যাঁকে স্বয়ং জিবরাঈল (আঃ) সালাম জানান এবং উত্তরে তিনি বলেন- তাঁর প্রতিও আল্লাহ্‌র শান্তি ও রহমত নাযিল হোক।

(৪) যাঁর কল্যাণে নাযিল হয় তায়াম্মুমের আয়াত।

(৫) যাঁর চাইতে অধিক কুরআনের মর্ম, হালাল-হারামের বিধি-বিধান, আরব কাব্য-কবিতা ও বংশবিদ্যায় পারদর্শী আর কেউ ছিল না।

(৬) যাঁর কাছে সাহাবায়ে কিরাম জটিল ও কঠিন সমস্যার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন এবং যথাযথ সমাধান লাভ করতেন।

(৭) যিনি এক দিনে সত্তর হাজার দিরহাম আল্লাহ্র রাহে খয়রাত করে দেন, অথচ তাঁর নিজের দেহে শোভা পায় তালি দেয়া জামা।

(৮) যিনি আবদুল্লাহ্ রাহে সদকা করেন। অথচ সেদিন তিনি রোযা রাখেন এবং রাতের খাবার গ্রহণের জন্য কোন তরকারিও ঘরে থাকে না।

(৯) যাঁর মুক্তি সনদ কুরআনে অবতীর্ণ হয়।

(১০) দ্বীন সম্পর্কে যে গভীর জ্ঞান তিনি অর্জন করেন, উম্মতের উদ্দেশ্যে দ্বীনের প্রচার তিনি সম্পাদন করেন। ইলমে নবুওয়তের প্রচারে যে প্রয়াস চালান, উম্মতের সন্তানদের প্রতি জ্ঞানগত যে কল্যাণ সাধন করেন তা অন্য কোন উম্মুল মু'মেনিন করতে পারেননি।

(১১) তিনিই সর্বাধিক অর্থাৎ ২২১০ খানা হাদীস বর্ণনা করেন।

(১২) তাঁর ওড়না দিয়েই বদর যুদ্ধে মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর পতাকা তৈরী হয় যে প্রতীকের আওতায় ফেরেশতারাও ইসলামের খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাথমিক বিজয় অবতীর্ণ হয়।

(১৩) যিনি বলতেনঃ "রাসূল (সাঃ) আমার ঘরে, আমার পালার দিনে আমার বুক গলার মাঝে ওফাতপ্রাপ্ত হন এবং শেষ পর্যায়ে আমার মুখের লালা রাসূল (সাঃ)এর লালার সাথে মিশে যায়। তা এভাবে যে, (আমার ভাই আবদুর রহমান) মিসওয়াক নিয়ে হাযির হয়। রাসূল (সাঃ) ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। (তা দেখে তিনি মিসওয়াক করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।) আমি সে মিসওয়াক নিজের মুখে চিবিয়ে নরম করে দিলে তিনি তা দ্বারা মিস্ওয়াক করেন।

(১৪) যাঁর কক্ষে রাসূল (রাঃ) ইন্তিকাল করেন।

(১৫) যার কক্ষে রাসূল (সাঃ) রওযা মির্মিত হয়।

উম্মতের সে কল্যাণ, বরকত ও মহামর্যাদার অধিকারিনী মাতার উপর বর্ষিত হোক লাখো সালাম। তিনি ৭৪ বছর বয়সে ৫৮ হিজরী সনের ১৭ই রমযান ইন্তিকাল করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং তাঁরই ওসিয়তক্রমে তাঁকে বাকী নামক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। তিনি বহু বিধবা, এতীম-অনাথ ও মিসকীনের লাল-পালন করতেন। কাজেই তাঁর ইন্তিকালে গোটা মদীনায় শোকের মামত নেমে আসে এবং জানাযায় বিরাট জন-সমাগম হয়।

হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর পর ইসলাম গ্রহণকারিণী প্রথম মহিলা

রাসূল (সাঃ)-এর চাচী এবং হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন সিহাবাহ বিন্তে হারেস (রাঃ)। তিনি উম্মুল ফযল ডাক নামেই খ্যাত ছিলেন। মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান আনার গৌবর যে উম্মুল মু'মেনীন হযরত খাদীজা (রাঃ)-ই অর্জন করেছিলেন তাতে কারো দ্বিমত নেই। তবে বিশ্বস্ত .... অনুযায়ী তাঁর পরে সর্বপ্রথমে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করেন রাসূল (সাঃ)-এর বর্ণনা শ্রদ্ধেয় চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর স্ত্রী হযরত উম্মুল ফযল। এদিক দিয়ে তিনি আস্ সাবেকূন আল আউয়ালূন। (প্রাথমিক মুসলমানদের অগ্রবর্তী) দের মধ্যে একান্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারিনী ছিলেন। তিনি তাঁর স্বামী হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পর মদীনা অভিমুখে হিযরত করেন। তাঁর এ হিযরত মক্কা বিজয়ের সামান্য কিছুদিন পূর্বে হয়েছিল। তিনি হেলাল গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর সহোদরা বোন হযরত মাইমুনা (রাঃ) বিন্তে হারেস যেহেতু রাসূল (সাঃ)-এর পত্নীত্বের গৌরব অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন, তাই তিনি সেদিক দিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরহিযগার ও ইবাদতগুযার মহিলা ছিলেন।

কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী তিনি প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার নিয়মিত রোযা রাখতেন। রাসূল (সাঃ) প্রায়শঃ বলতেন, উম্মুল ফযল, মাইমুনা, সালমা ও আসমা হল চার মুমিন, বোন। একবার হযরত উম্মুল ফযল স্বপ্নে দেখলেন, রাসূল (সাঃ)-এর দেহের একটি অংশ তাঁর ঘরে রয়েছে। তিনি রাসূল (সাঃ)এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, "এর ব্যাখ্যা হল যে, আল্লাহ্ তায়ালা আমার আদরের দুলালী ফাতিমাকে সন্তান দান করবেন আর তুমি তাকে দুধ খাওয়াবে।" সুতরাং হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর ঘরে হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর জন্ম হলে তিনি তাঁকে দুধ খাওয়ান এবং তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

বিদায় হজ্জের সময় রাসূল (সাঃ) সাথে তার হজ্ব পালনের সৌভাগ্য অর্জিত হয়। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে তিনি নিজের স্বামীর সামনেই ইন্তিকাল করেন। তাঁর জানাযার নামায পড়ান হযরত ওসমান (রাঃ)। তাঁর গর্ভে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর ছয় পুত্র ফযল, আবদুল্লাহ্ (রাঃ), মুঈন (রাঃ), কুলসুম (রাঃ), আবদুর রহমান (রাঃ) ও উবাইদুল্লাহ্ (রাঃ) এবং এক কন্যা উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) এর জন্ম হয়। জীবনীকারগণ লিখেছেন যে তাঁর পুত্রগণ সবাই অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। বিশেষ করে হযরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ) ইমামতের অংশ বলে অভিহিত হতেন এবং বিশিষ্ট্য মুফাস্সির ছিলেন। হযরত উম্মুল ফযল (রাঃ) থেকে বিশটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ঈমান আনয়নকারিণী প্রথম মহিলা

সত্যের ব্যাপারে মতানৈক্যের কোন অবকাশ নেই যে রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান আনার গৌরব অর্জন করেছিলেন তাঁর জীবনসঙ্গিনী উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদীজা (রাঃ)। কারণ, স্ত্রীই হয়ে থাকে একজন পুরুষের জীবনসঙ্গিনী। স্বামীর জন্য স্ত্রী অপেক্ষা অন্তরঙ্গ ও সহমর্মী আর কে-ই বা হতে পারে। তিনিই হয়ে থাকেন স্বামীর প্রকাশ্য ও গোপনীয়তার রক্ষায়িত্রী। বস্তুতঃ এখানেতো সমগ্র মক্কার মাঝে সর্বাধিক সাধ্বী মহিলা উম্মুল মুমেনীন আর রাসুল (সাঃ)-এর অন্তরঙ্গতার প্রশ্ন। আবার অন্তরঙ্গতাও এমন এক সময়ের, যখন তাঁর সরতাজ (মাথার মুকুট) ভরা যৌবনের দিগুলো অতিবাহিত করছিলেন। সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী তাঁর জীবন সঙ্গীর অন্তরের সুগভীর প্রদেশের প্রতি বার বার লক্ষ্য করেছেন। তাঁর আশা-আকাঙ্খা পরখ করেছেন। কিন্তু তাঁকে দিনের আলোয় কিংবা রাতের আঁধার সর্বত্রই নিষ্কলুষ ও নিষ্ঠাবান পেয়েছেন। সে কারণেই (১৮ই রমযান, ১৭ ই আগষ্ট ৬১০ ঈসায়ী) থেকে ছ'মাস পূর্বে যখন তিনি নিজের স্বামীকে ব্যাকূল অবস্থায় দেখতে পেলেন, তখন তাঁর মুখ থেকে অজান্তেই বেরিয়ে গিয়েছিল, "আল্লাহ্ আপনাকে চিন্তাগ্রস্ত করবেন না।"

উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ)-এর মত সতী-সাধ্বী মহিলা তাঁর স্বামী রাসূল (সাঃ)-এর সত্যভাষী মুখ থেকে 'ইকরা' -এর ঘটনা শুনবেন আর কোন সংশয়ে পতিত হবেন, তা কেমন করে হতে পারে? এটা তেমনি হতে পারে যেমন মধ্য দিনের সূর্যকে দেখেও কেহ তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করে। তাই সত্যজ্ঞ মহিলা নবুয়ত রবির প্রথমে ছটা দেখামাত্রই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। ওহী নাযিলের ঘটনা শুনিয়ে রাসূল (সাঃ) তাওহীদের তবলীগের সূচনা করেন আর এতে 'বিশ্বাস করলাম' এবং সত্য বলে স্বীকার করলাম' বলার গৌরব সর্বপ্রথম সে মহিলায় অর্জন করলেন, যিনি পনের বয়সের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে রাসূল (সাঃ) কেই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও সত্যনিষ্ঠ পেয়েছিলেন।

হযরত খাদিজা (রাঃ)

উম্মুল মু'মেনীন হযরত খাদীজা (রাঃ) ছিলেন খোওয়াইলিদ ইব্নে আসাদ ইব্নে আবদুল ওযায ইব্নে কোসাই-এর দুলালী। কোসাই পর্যন্ত গিয়ে তাঁর বংশ পরম্পরা রাসূল (ষাঃ)এর বংশ পরম্পরার সাথে মিশে যায়। তাঁর মাতা ছিলেন ফাতিমা বিন্‌তে যায়েদা। তিনি ছিরেন আমের ইব্নে লুওয়াই এর বংশধর। তাঁর

পিতা ছিলেন একজন সম্মানিত ব্যবসায়ী। তাঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিল আবু হালা ইব্নে যাররাহ তামীমার সাথে। এর ঔরসে তাঁর দুই পুত্র হালা হারেসের জন্ম হয়। আবু হালাহর মৃত্যুর পর তিনি আতীক ইব্নে আয়েদ মাখযুমীর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এ পক্ষে তাঁর হিন্দা নামে এক কন্যার জন্ম হয়। আতীকের মৃত্যুর পর তিনি তৃতীয় বিয়ের ইচ্ছা পরিহার করেন এবং গোটা মনোযোগ ব্যবসা-বাণিজ্যে সম্প্রসারণে কেন্দ্রীভূত করেন।

তিনি রাসূল (সাঃ)-এর বিশ্বস্ততা ও সরলতার প্রভাবিত হয়ে নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁরই হাতে সমর্পণ করেন। তাতে অল্প সময়েই মালামালের প্রাচুর্য এসে যায়। তিনি রাসূল (সাঃ)এর চরিত্রমাধুর্য ও আচার-আচারণে এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি এক সময়তাঁকে নিজের জীবনসঙ্গী নির্বাচন করে নেন এবং এভাবে উম্মুল মুমেনীনের গৌরব অর্জন করতে সমর্থ হন। রাসূল (সাঃ) তাঁর নিবেদনক্রমে নিজের পিতৃগৃহ ছেড়ে তাঁর বাড়িতে এসে স্থায়ী ভাবে বসবাাস করতে শুরু করেন। এ পূণ্যগৃহ অচিরেই সমগ্র পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা আদর্শ গৃহে পরিণত হয়ে যায়। রাসূল (সাঃ) যখন প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন এবং কাফেররা তাঁকে কঠিন জটিলতায় ফেলে দেয়, নানারকম দুঃখ-কষ্ট দিতে থাকে, তখন উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদীজা (রাঃ) জান মাল দিয়ে এক অভূতপূর্ব সাহায্য-সহায়তায় এগিয়ে আসেন।

স্বয়ং রাসূল (সাঃ) -এর ইরশাদ করেছেনঃ আমি কাফেরদের কোন কথায় যখন মর্মাহত হতাম, তখন তা খাদীজা কে বলতাম। সে এমনভাবে আমাকে সাহস জোগাত যাতে আমার অন্তর প্রশান্তিতে ভরে উঠত। এমন কোন চিন্তা আমার ছিল না যা খাদীজার কথায় সহজ ও হালকা হযে যেত না। শিয়াবে আবু তালেবে রাসূল (সাঃ) উপর যে কঠিন সময় অতিবাহিত হয়, তাতে উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদীজা (রাঃ) ও সমান অংশীদার ছিলেন। নবুওয়াত লাভের ১০ম বছর হযরত খাদীজা ইন্তিকাল করেন। রাসূল (সাঃ) মক্কায় নিকটবর্তী 'হাজুন' নামক পাহাড়ের পাদদেশে তাঁকে দাফন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর গর্ভে রাসুল (সাঃ)-এর নিম্ন বর্ণিত সন্তান-সন্তুতির জন্ম হয়েছিল।

পুত্র ঃ (১) কামেস (রাঃ)। দু' আড়াই বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। (২) আবদুল্লাহ্। তাঁকে তাহের ও তইয়্যেব নামেও ডাকা হত। শৈশবেই তাঁর ইন্তিকাল হয়।

কন্যা ঃ (১) হযরত যায়নব (রাঃ), (২) হযরত রুকাইয়া (রাঃ), (৩) হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও (৪) হযরত উম্মে কুলসূম (রাঃ)।

হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পর একবার তাঁর বোন হযরত হালাহ (রাঃ) রাসূল (সাঃ)এর সাথে দেখা করতে মদীনায় আসেন এবং অনুমতি প্রার্থনার রীতি অনুযায়ী ভেতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁর কণ্ঠস্বরও অনেকটা হযরত খাদীজার কণ্ঠস্বরের মতই ছিল। সে শব্দ শুনতেই রাসূল (সাঃ)এর হযরত খাদিজার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বলে উঠলেনঃ "হালাহ হবে হয়ত।" হযরত আয়িশা (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রাসূল (সাঃ)-এর এ কথা শুনে তার মনে ঈর্ষার উদয় হয়। তিনি বললেন, "আপনি (এখনো) এক বৃদ্ধার কথা মনে করেন! তার এমনি প্রশংসা করেন! তিনি তো বয়োবৃদ্ধা ছিলেন। আল্লাহ্ যে আপনাকে তার চেয়ে উত্তম বদলা দিয়েছেন।" একথা শুনে রাসূল (সাঃ) রাগান্বিত হয়ে বললেন–(১) আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে তার চাইতে উত্তম বদলা দেননি।

(২) মানুষ যখন আমার উপর ঈমান আনতে অস্বীকার করেছিল, তখন তিনি আমার উপর ঈমান এনেছেন।

(৩) যখন মানুষ আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তখন তিনি আমাকে সত্য বলেছেন।

(৪) মানুষ যখন আমাকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে, তখন তিনি অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে আমার সাহায্য করেছেন।

(৫) যখন আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে অন্য স্ত্রীর মাধ্যমে সন্তান দানে বঞ্চিত রাখেন, তখন তার মাধ্যমে সন্তান দান করেন।

হযরত আয়েশা বলেন, কথাগুলো রাসূল (সাঃ) এমনভাবে বলেছিলেন যাতে আমি ভয় পেয়ে যাই এবং সেদিন থেকে মনে মনে অঙ্গীকার করে নেই যে, ভবিষ্যতে আর ককনো রাসূল (সাঃ)-এর সামনে খাদীজাকে যেনতেন বলব না। তিনি বলেন, যদিও আমি হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে কখনো দেখিনি কিন্তু তাঁর প্রতি আমার ঈর্ষা হত। কারণ রাসূল (সাঃ) বরাবরই তাঁর কথা আলোচনা করতেন। নিম্নে হযরত খাদীজা (রাঃ) এর কয়েকটি মহত্ব বর্ণনা করা হল–(১) তিনি রাসূল (সাঃ)-এর মহান ও পবিত্র চরিত্র মাধুর্যে প্রভাবিত হয়ে নিজে তাঁর সাথে বিয়ের আবেদন করেন। (২) বিয়ের পরে তিনি মনে-প্রাণে ধন-দৌলতের মাধ্যমে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমত করেন। (৩) তিনি নৈরাশ্যের ভীড়ে রাসূল (সাঃ)-কে সান্ত্বনা যোগান। (৪) তিনি সমস্ত নারী-পুরুষের পূর্বে ইসলামের অন্তর্ভূক্ত হন। (৫) আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং তাঁকে সালাম প্রেরণ করেন। (৬) জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে সালাম জানান। (৭) রাসূল (সাঃ) তাঁকে সর্বদা স্মরণ করেন। (৮) হযরত মারিয়া কিবতিয়ার ঘরে সন্তান-সন্ততি তাঁরই ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। (৯) তাঁর জীবদ্দশায় রাসূল (সাঃ) আর কোন বিয়ে করেননি।

তৃতীয় অধ্যায়

রাসূল (সাঃ) ও সাহাবা (রাঃ)-দের আল্লাহ্ভীতি

ইহ্কাল ও পরকালের পরিত্রাণকারী রাসূল (সাঃ)-এর আল্লাহ্ভীতির অবস্থা ছিল নিম্নরূপ। অথচ পবিত্র কালামে পাকে ইরশাদ হচ্ছেঃ 'হে নবী, আপনার জীবদ্দশায় আল্লাহ্ তায়ালা কখনও তাদের (মুসলমানদের) উপর আযাব অবতীর্ণ করবেন না।' মহান আল্লাহ্র এত বড় ওয়াদা সত্ত্বেও রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর অবস্থা এমন ছিল যে, ঝড়-তুফানের আশংকা দেখলেই তিনি পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি সমূহের কথা স্মরণ করে অস্থির হয়ে পড়তেন। আর আমাদের অবস্থা এ যে, দিবারাত্রি পাপাচারে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিভিন্ন প্রকার আযাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও এর দ্বারা উৎকণ্ঠিত হয়ে তওবাহ্, ইস্তেগফার নামাযে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে নানা প্রকার গর্হিত বিষয় নিয়ে আমোদ প্রমোদে লিপ্ত রয়েছি।

ঝড়-তুফানের সময় রাসূল (সাঃ)-এর মানসিক অবস্থা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন আসমানে ঘন কাল মেঘের কোন আনাগোনা দেখা যেত, তখন রাসূল (সাঃ)-এর নূরানী চেহারা মোবারকে আতংকের ভাব পরিলক্ষিত হত এবং চেহারা বিবর্ণ আকার ধারণ করত। এমতাবস্থায় তিনি একবার ঘরে প্রবেশ করতেন আবার বাইরে আসতেন এবং এ বলে পানাহ্ চাইতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَ خَيْرَ مَافِيْهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَ
اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَافِيْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ ـ

অর্থ ঃ হে আমার রব! আমি তোমার কাছে এ বায়ূর মঙ্গল কামনা করছি এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে এবং যে জন্যে তা প্রেরিত হয়েছে সবেরও মঙ্গল কামনা করছি। আর এ বায়ুর অমঙ্গল হতে এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে এবং যে উদ্দেশ্যে তা প্রেরিত হয়েছে ওসবের অমঙ্গল হতে তোমার আশ্রয় কামনা করছি। বৃষ্টি যখন আরম্ভ হত তখন রাসূল (সাঃ)-এর চেহারা মোবারক আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি আরয করতাম ঃ ইয়া

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)! আকাশে মেঘ দেখলে বৃষ্টির পূর্ব লক্ষণ মনে করে লোকেরা আনন্দিত হয় আর আপনি তখন চিন্তিত হয়ে পড়েন কেন? এর উত্তরে রাসূল (সাঃ) বলতেনঃ হে আয়েশা-এর মধ্যেই যে আল্লাহ্‌র আযাব ও গযব লুকায়িত নেই তার নিশ্চয়তা আছে কি? মহান আল্লাহ্ বায়ূর দ্বারাই আ'দ জাতিকে আযাব দিয়েছিলেন অথচ তখন তারা বৃষ্টির আশায় মেঘ দেখে দেখে আনন্দিত হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে এ মেঘের মধ্যেই নিহিত ছিল আসমানী আযাব যা আ'দ সম্প্রদায়ের উপর নিপতিত হয়েছিল। আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মাজীদে বর্ণনা করেছেন ঃ আ'দ জাতি যখন মেঘরাশিকে তাদের বস্তি অভিমুখে আগমন করতে দেখল তখন তারা বলল, এ মেঘখন্ড হতে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে; কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, এটা বর্ষণকারী মেঘ নয় বরং এর মধ্যে নিহিত রয়েছে সে ভয়াবহ আযাব, যে বিষয়ে তাড়াহুড়া করতে (অর্থাৎ নবীকে বলতে, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে তুমি আমাদের উপর কোন আযাব অবতীর্ণ কর)।

এটি (মেঘরাশি) একটি প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়, যার মধ্যে কঠিন আযাব বিদ্যমান রয়েছে, যা তার মনিবের আদেশে প্রতিটি বস্তুকে ধ্বংস করে দিবে। বস্তুতঃ তারা (আ'দ জাতি) এ ঝড়ের দরুন এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হল যে, তাদের ঘর বাড়ির সামান্যতম চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। আমি নাফরমানদেরকে এভাবেই শাস্তি প্রদান করি। −(বয়ানুল কুরআন)

অন্ধকারের সময় হযরত আনাস (রাঃ)-এর আমল

হযরত আনাস (রাঃ)-এর জীবদ্দশায় একবার দিনের বেলায় ভীষণ অন্ধকার দেখা দিল। আমি খিযির বিন আবদুল্লাহ হযরত আনাস (রাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (সাঃ)-এর জামানায়ও কি কখনও এরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন হত? তিনি বললেন, রাসূল (সাঃ)-এর জামানায় বাতাস খানিকটা জোরে প্রবাহিত হলেই, কিয়ামত এসে গেল নাকি এ ভয়ে আমরা দৌড়ে মসজিদে হাযির হতাম। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ)-এর অভ্যাস ছিল, আকাশে ঝড় উঠলেই তিনি অস্থির হয়ে মসজিদে আশ্রয় নিতেন।

সূর্যগ্রহণের সময় রাসূল (সাঃ)-এর আমল

রাসূল (সাঃ)-এর জামানায় একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। সাহাবী (রাঃ)-গণ ভাবলেন, এ অবস্থায় রাসূল (সাঃ) কি করেন তা দেখার উদ্দেশ্যে সমস্ত সাহাবী (রাঃ)-গণ নিজ কাজ কর্ম ছেড়ে দিয়ে এমন কি যুবক ছেলে যারা মাঠে তীর-ধনুক নিয়ে অনুশীলন করছিল তারাও রাসূল আকরাম (সাঃ)-এর দরবারে একত্রিত হল। তখন রাসূল (সাঃ) দু'রাকাত কুসুফের নামায আদায় করেছিলেন। এ নামায এত সুদীর্ঘ ছিল যে, যে সব সাহাবী (রাঃ)-গণ তাঁর সাথে নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন তখন তাঁদের অনেকেই বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন। এ নামাযে রাসূলে আকরাম (সাঃ) কাঁদতে কাঁদতে এ দোয়া করছিলেন−"হে আমার রব! আপনি কি আমার সাথে ওয়াদা করেন নি যে, আমার বর্তমানে আপনি এদেরকে (মুসলমানদেরকে) আযাব দিবেন না আর যখন তারা ইস্তেগফার করতে থাকবে তখনও তাদের প্রতি কোন আযাব প্রেরণ করবেন না।" এরপর রাসূল (সাঃ)-সাহাবী (রাঃ)-দেরকে এ বলে নসীহত করলেন, "যখনই সূর্য অথবা চন্দ্র গ্রহণ হবে তখনই তোমরা আতংকিত হয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে যাবে। আমি আখিরাতের যে ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি যদি তোমরা তা দেখতে তাহলে কম হেসে বেশি বেশি কাঁদতে। যখনই তোমরা এ অবস্থায় পতিত হবে, তখনই নামায পড়ে, দোয়া করবে এবং সদ্‌কা করবে।

সারারাত রাসূল (সাঃ)-এর ক্রন্দন

একবার রাসূল (সাঃ) সারারাতভর কেঁদে কেঁদে ফযর পর্যন্ত অতিবাহিত করেন এবং তিনি ফযরের নামাযে শুধু এ আয়াতটি তিলাওয়াত করছিলেন−

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ -

অর্থ ঃ "হে আমার রব আপনি যদি এদেরকে শাস্তি দেন তাহলে দিতে পারেন, যেহেতু এরা আপনারই বান্দা আর যদি আপনি এদেরকে ক্ষমা করে দেন তাহলে তাও করতে পারেন, কেননা আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" −(সূরাহ মাইদা ঃ ১১৮

আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ হে আল্লাহ্! তুমি যখন তাদের রব, তখন তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তাহলে তারা তো তোমারই বান্দাহ এবং তুমি তাদের মালিক, মালিক ইচ্ছা করলে ভৃত্যের ত্রুটির জন্য তাকে শাস্তি দিতে পারেন।

আর তুমি যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও তাও তোমার ইচ্ছাধীন। কারণ তুমি সর্বশক্তিমান, একচ্ছত্র প্রভু!

আমার অবস্থা কিরূপ হবে

বর্ণিত আছে–একবার ইমাম আযম আবু হানিফা (রহঃ) সারারাত্রি–

وامتازو اليوم ايها المجرمون -

এ আয়াতটি পাঠ করতে থাকেন, আর ক্রন্দন করতে থাকেন। আয়াতের সারমর্ম কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম হবে– "হে পাপীষ্ঠরা, তোমরা (নিষ্পাপদের থেকে) পৃথক হয়ে যাও।" –(সূরা ইয়াসীন ঃ ৫৯) এ আয়াতের তাৎপর্য হল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা গুনাহগারদেরকে আদেশ দিবেন, 'তোমরা দুনিয়াতে একত্রে বসবাস করেছ; কিন্তু আজ পাপীরা পূণ্যবানদের কাছে থেকে আলাদা হয়ে যাও।' এ কথা স্মরণ করেই ইমাম আযম (রহঃ) সারারাত ক্রমাগত ক্রন্দন করেছিলেন। কারণ, কিয়ামতের দিন তাঁকে পুণ্যবান না পাপী হিসাবে বিবেচনা করা হবে, তা তাঁর জানা নেই এ ভয়ে। মানুষের আমলনামায় কি লেখা আছে, তা কেউ জানে না আর কোন কাজে আল্লাহ্ তায়ালা সন্তুষ্ট হন তাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। আল্লাহ্ তায়ালা যে আমলের দ্বারা সন্তুষ্ট সেটাই সৎকার্যরূপে আমলনামায় লিখা হয় আর যে আমলে তিনি নারাজ হন সেগুলোই বদ আমল রূপে লিপিবদ্ধ হয়। কাজেই কোন ব্যক্তিই নিজের আমল সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে না, সে পাপী না পূণ্যবান। মানুষের চিরাচরিত স্বভাব হল সামান্য নেক কাজে তৃপ্তি অনুভব করে এবং পাপাচারীকে হেয় প্রতিপন্ন করে ঘৃণা করে অথচ পূণ্যের প্রতীক সত্ত্বেও হযরত ইমাম আযম (রহঃ)ও নিজের আমল সম্বন্ধে নিজেকে পাপী মনে করেই আল্লাহ্র ভয়ে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন। আর আমরা সামান্যতম নেক কাজ করলেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে সমাজে প্রচারের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। কতভাবে নিজের মহিমা প্রকাশ করি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অথচ ইমাম আযম (রহঃ) এর আমলের সাথে আমাদের আমলের পার্থক্য কি তা একবার ভেবে নেক কাজের মহিমা প্রচার থেকে বিরত থাকা উচিত। আর একথাও আমাদের সদাসর্বদা স্মরণ রাখা উচিত "মৃত্যু অলিখিতভাবে হঠাৎ একদিন এ সংসার হতে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, একথা ভেবে যে ব্যক্তি ইহ্কালেই পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করতে সদাসর্বদা তৎপর থাকে সে ব্যক্তিই বুদ্ধিমান।

পরকালের একমাত্র পাথেয় সৎ আমল, যে ব্যক্তি সংগ্রহ করবে সে নাযাত পাবে। পরকালের মুক্তির এটাই প্রথম ও প্রধান শর্ত।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর আল্লাহ্ভীতি

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সমস্ত ওলামায়ে কিরামের মতানুসারে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) নবীদের পর মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব, তিনি নিঃসন্দেহে বেহেশ্তী বলে আল্লাহ্র নবী (সাঃ) ঘোষণা করেছেন। তিনি একদল বেহেশ্তীর সরদার হবেন। বেহেশ্তের প্রতিটি দরজা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে আহবান করবে আর উম্মতের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম বেহেশ্তে প্রবেশ করবেন। তিনি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও আক্ষেপ করে বলতেন, আমি যদি ঘাস হতাম, যা জানোয়ারে খেয়ে ফেলত। আবার কোন কোন সময় বলতেন, আমি যদি কোন মুমিনের গায়ের পশম হতাম। আবার কখনো কখনো বলতেন, যদি আমি কোন গাছ হতাম যা কেটে ফেলা হত। একদিন জঙ্গলে গিয়ে একটি জানোয়ারকে বসা অবস্থায় দেখে সুদীর্ঘ এক নিশ্বাস ফেলে বললেন, হে জানোয়ার, তুমি কত সুখ-শান্তিতে রয়েছ, খাও, ছায়ায় বিচরণ কর এবং পরকালে তোমার উপর হিসাব-নিকাশের কোন বোঝাই থাকবে না, হায় আফসোস! আমি যদি তোমার মত হতাম। নিজের জীবন সম্পর্কে তাঁর ধারণা এরূপ ব্যতিত আর কিছুই ছিল না। –(তারীখুল খুলাফা)

রাবীয়া আসলামী (রাঃ) বলেন, একবার হযরত আবু বকর (রাঃ) ও আমার মধ্যে কোন বিষয়ে মত-পার্থ ক্য দেখা দিলে কিছু তর্ক-বিতর্কে তিনি কটু কথা বললে আমি আন্তরিকভাবেই ব্যথিত হলাম। তিনি সাথে সাথেই তা উপলব্ধি করে আমাকে বললেন, তুমিও আমাকে অনুরূপ কথা বলে প্রতিশোধ নাও। আমি এরূপ প্রতিশোধ নিতে অস্বীকার করলে তিনি বললেন, আমি রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে গিয়ে নালিশ করব। আমি তাতে অস্বীকৃতি জানালাম। তিনি চলে গেলেন। এমন সময় বনী আসলামের লোকজন এসে বলল, এ কেমন কথা; তিনিই অন্যায় করে আবার তিনিই রাসূল (সাঃ)-এর কাছে নালিশ করতে গেলেন। আমি বললাম, ইনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)। তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হলে ধ্বংস অনিবার্য।

এরপর রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে আমি হাযির হয়ে পুরা ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি (সাঃ)-শুনে বললেন, তুমি ঠিকই করেছ। কখনো প্রতিশোধমূলক উত্তর দেয়া উচিত নয়। তবে এভাবে বলে দাও, হে আবু বকর! আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন। সত্যিকার আল্লাহ্ভীতি একেই বলে। একটা কথার জন্য

এত চিন্তা? হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) -এর মত লোক হঠাৎ একটি মাত্র কটু কথা বলে একজনের মনে কষ্ট দিয়েছেন। কিন্তু এ কথার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাঁর কত চিন্তা, কত চেষ্টা। প্রথমে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন, প্রতিশোধ না নিলে তার বিরুদ্ধে রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে নালিশ করবেন এ ধরনের কথা বললেন অর্থাৎ যে করেই হোক নিজের ক্রটির জন্য আল্লাহ্‌র বান্দা থেকে ক্ষমা লাভ করতে হবে, নতুবা হাশরের দিন এ হক্কুল ইবাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহী করতে হবে। পাঠক চিন্তা করুন আল্লাহ্ ভীতি আর কাকে বলে। মানুষের মনে আমরা প্রতিনিয়ত কত শত উপায়ে কষ্ট দিয়ে থাকি; কিন্তু আল্লাহ্‌র ভয়ে তাদের ক্ষমা চেয়ে মুক্তি লাভ করার চিন্তা কোন দিন আমাদের মনে উদয় হয় কি?

আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হযরত ওমর (রাঃ)

কোন কোন সময় হযরত ওমর (রাঃ) একটি তৃণখন্ড হাতে নিয়ে অনুরূপ হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। আবার কখনও বলতেন, আমার যদি জন্মই না হত। এরূপ আক্ষেপ সদা সর্বদাই করতেন। একদিন তিনি এক কাজে লিপ্ত থাকা অবস্থায় জনৈক ব্যক্তি এসে নালিশ করল যে, অমুক ব্যক্তি আমার উপর জুলুম করেছে, আমি আপনার কাছে এর সুবিচার চাই। হযরত ওমর (রাঃ) লোকটিকে বেত্রাঘাত করে বললেন, এ কাজের জন্য যখন বসি তখন আস না কে? এখন অন্য কাজে ব্যস্ত রয়েছি। আর এসেই বল যে, আমি অমুকের বিচার চাই। লোকটি চলে যাওয়ার পর হযরত ওমর (রাঃ) তৎক্ষণাৎ লোক পাঠিয়ে এ ব্যক্তিকে ডেকে এনে তার হাতে চাবুক দিয়ে বললেন, আমাকে এখনই বেত্রাঘাত করে প্রতিশোধ নিয়ে আমাকে রক্ষা কর। এটাই তোমার কাছে আমার আন্তরিক আবেদন। তখন লোকটি বলল, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম। সে মুহূর্তে হযরত ওমর (রাঃ) ঘরে গিয়ে দু'রাকাআত নফল নামায আদায় করে নিজেকে সম্বোধন করে আক্ষেপ করে বলতে লাগলেন, "হে ওমর! তুমি কতই নিকৃষ্ট ছিলে, আল্লাহ্ তোমাকে সম্মানিত করেছেন। তুমি পথভ্রষ্ট ছিলে। আল্লাহ্ তোমাকে হিদায়াত করেছেন। তুমি অপদস্ত ছিলে, আল্লাহ্ তোমাকে ইজ্জত প্রদান করে মানুষের প্রতিনিধি করেছেন। এখন তোমার কাছে এসে একজন ফরিয়াদী তার উপর জুলুমের বিচার প্রার্থী হল আর তুমি তাকে উল্টা বেত্রাঘাত করে তাড়িয়ে দিলে? কাল কিয়ামতে তুমি কি জওয়াব দিবে? অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি এভাবে নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকলেন।" হযরত আসলাম (রাঃ) ছিলেন হযরত ওমর (রাঃ)-এর গোলাম। তিনি বলেন, আমি

একদিন হযরত ওমর (রাঃ)-এর সাথে মদীনার অদূরে হাররা নামক স্থানে যাওয়ার সময় জনমানবহীন প্রান্তরে আগুন দেখা গেলে তিনি বললেন, হয়ত কোন কাফেলা হবে, রাত্রি হয়ে যাওয়ার দরুন শহরে প্রবেশ করতে না পেরে মাঠেই তাঁবু ফেলেছে। সেখানে গিয়ে আমরা দেখতে পেলাম, একটি মেয়েলোক বসে আছে। তার আশেপাশে কয়েকটি ছেলে মেয়ে চিৎকার করে কান্নাকাটি করছে। পাশেই একটি চুলায় আগুন জ্বলছে, তার উপর পানি ভর্তি একটি পাত্র রয়েছে।

এমতাবস্থায় হযরত ওমর (রাঃ) সালাম দিয়ে কাছে আসার অনুমতি চাইলে স্ত্রী লোকটির অনুমতি পেয়ে কাছে গিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বাচ্চাগুলো কাঁদছে কেন। মেয়েলোকটি বলল, ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে কাঁদছে। তিনি বললেন, পাত্রের মধ্যে কি রয়েছে? সে বলল, পানি ভর্তি করে চুলার উপর রেখেছি, যেন বাচ্চাগুলো খাবারের আশায় কিছুটা শান্ত্বনা পেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এরপর মেয়েলোকটি বলল, আমার এবং আমীরুল মুমেনীন হযরত ওমরের ফয়সালা আল্লাহ্‌র দরবারে হবে। তিনি কেন আমাদের এরূপ দুরবস্থায় কোন খবর নিচ্ছেন না? এ কথা শুনে হযরত ওমর (রাঃ) কেঁদে বললেন, আল্লাহ্ তোমার উপর রহমত নাযিল করুন, ওমর তোমাদের এরূপ দুর্দশার অবস্থা কি করে জানবেন? মেয়েলোকটি বসল, তিনি আমাদের প্রতিনিধি, অথচ আমাদের কোন খোঁজ খবর রাখবেন না এটা কেমন কথা? হযরত আসলাম (রাঃ) বলেন, এ কথা শুনে তিনি আমাকে সাথে করে মদীনায় ফিরে এসে বায়তুল মাল থেকে কিছু আটা, চর্বি, কয়েকটি কাপড় এবং কিছু অর্থ নিয়ে একটি বস্তায় ভর্তি করে বললেন, বস্তা ভর্তি এ বোঝা আমার পিঠে তুলে দাও। তখন আমি আরয করলাম, হে আমিরুল মুমেনীন, এ হতে পারে না বরং এ বোঝা আমি বহন করে নিয়ে যাব। তখন তিনি বললেন না, এ বোঝাটা আমাকেই বহন করতে দাও। এভাবেই দু'তিন বার অনুরোধ করার পর তিনি বললেন, কিয়ামতের দিনও কি তুমিই আমার বোঝা উঠাবে? এ বোঝাটা আমাকেই বহন করতে হবে, কেননা এ ব্যাপারে কিয়ামতের দিন আমাকেই প্রশ্ন করা হবে।

অবশেষে আমি বাধ্য হয়েই বস্তাটি খলিফার পিঠে তুলে দিলাম। তিনি খুব দ্রুতগতিতে মেয়েলোকটির কাছে পৌঁছে গেলেন। আমিও সাথে ছিলাম। সেখানে পৌঁছেই তিনি পাত্রের মধ্যে আটা, খেজুর ও কিছুটা চর্বি ঢেলে চুলায় আগুন ধরিয়ে নিজেই পাক শুরু করে দিলেন। হযরত আসলাম (রাঃ) বলেন,

আমি দেখলাম, তাঁর ঘন দাড়ির ভিতর দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হারীরার মত এক প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করে তিনি নিজ হাতে খাবার পরিবেশন করে শিশুদের খাওয়ালেন। পরিতৃপ্ত হয়ে শিশুরা খাবার খেয়ে আনন্দে মশগুল হয়ে গেল। তিনি অবশিষ্ট খাবার মেয়েলোকটির হাতে তুলে দিলে মেয়েলোকটি আনন্দিত হয়ে বলল, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে এর উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করুন। তুমিই ছিলে খলিফার উপযুক্ত; ওমরের স্থলে তোমাকেই খলীফা করা উচিত ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি যখন ওমরের কাছে যাবে তখন সেখানে আমাকেও দেখতে পাবে। হযরত ওমর (রাঃ) ফযরের নামাযে অধিকাংশ সময় সূরা কাহফ ও সূরা ত্বা-হা প্রভৃতি সুদীর্ঘ সূরা পাঠ করে ক্রন্দন করতেন। কান্নার শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে যেত। একবার ফযরের নামাযে সূরা ইউসুফ পড়া অবস্থায়। যখন انما اشكو بثى وحزنى পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন এত বেশি কাঁদলেন যে, শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। তাহাজ্জুদের নামাযে অনেক সময় ক্রন্দন করতে করতে পড়ে যেয়ে বেহুশ হয়ে যেতেন। কি অদ্ভুত আল্লাহ্র ভয়। যাঁর ভয়ে পৃথিবী কম্পিত হত, যাঁর নামে বড় বড় রাজা-বাদশারা পর্যন্ত ভয়ে কম্পিত থাকত, চৌদ্দ শত বছর পর আজও যাঁর খ্যাতি পৃথিবীর ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে, সে পূণ্যবান মহাপুরুষ হযরত ওমর (রাঃ)-এর অন্তরও আল্লাহ্র ভয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। এ যুগে কোন বাদশাহ বা আমীর, প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট, প্রজা-সাধারণের সাথে এরূপ ব্যবহার করে থাকে কি? শাসক আর প্রজার দূরত্ব যে কত আজ তার ব্যবধান বর্ণনা করা সত্যিই দুস্কর।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে আব্বাস (রাঃ)-এর উপদেশ

হযরত ওহাব ইব্নে মুনাব্বেহ (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাস (রাঃ)-এর দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তিনি আমাকে নিয়ে কা'বা শরীফ পৌঁছলেন। সেখানে কিছু লোকের ঝগড়া-বিবাদ শুনে তিনি আমাকে এ ঝগড়ার স্থানে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলে আমি তাই করলাম। সেখানে তিনি পৌঁছে সবাইকে সালাম করলেন, লোকেরা তাঁকে বসার আবেদন করলে, তিনি অস্বীকার করে বললেন, তোমরা কি জান না যে, যারা আল্লাহ্র খাস বান্দা, আল্লাহ্র ভয় তাদেরকে সব সময় চুপ করে রাখে। অথচ তাঁরা দুর্বলও নয় এবং বোকাও নন। বরং তারা ভাষা জ্ঞানে পন্ডিত, বাক্ শক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিমান। কিন্তু

আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্বের কথা ভেবে আজ তাদের বুদ্ধি নিস্তব্ধ, ভগ্নহৃদয় এবং কণ্ঠ নীরব। এ অবস্থা যখন তাদের উপর স্থায়ী হয়ে যায়, তখন এর উসিলায় তারা নেক কাজে দ্রুত অগ্রসর হয়ে থাকেন। আজ তোমরা এসব নেক বান্দা হতে কত দূরে সরে পড়েছ? হযরত ওহাব (রাঃ) বলেন এরপর থেকে আমি দু ব্যক্তিকেও একত্র হতে দেখিনি। হযরত ইব্নে আব্বাস (রাঃ) আল্লাহ্র ভয়ে এত বেশি ক্রন্দন করতেন যে, অত্যধিক পরিমাণে অশ্রু প্রবাহিত হওয়ার দরুন চেহারা মোবারকে দু'টি নালীর মত ঘা হয়ে গিয়েছিল। উপরের বর্ণনায় হযরত ইব্নে আব্বাস (রাঃ) নেক কাজসমূহ সম্পাদন করার একটা সহজ পন্থা বলে দিয়েছেন তাহল আল্লাহ্র শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করবে এর দ্বারা প্রত্যেকটি নেক আমল করা সহজ হবে এবং সেগুলো অবশ্যই ইখলাসে পরিপূর্ণ হবে। দিবারাত্রি চবিবশ ঘন্টার মধ্যে সামান্য সময় যদি আমরা এ কাজের জন্য ব্যয় করি তাহলে তা কি খুব কঠিন বলে মনে হবে। সময় খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে একথা আমরা কি কখনো চিন্তা করি।

তাঁবুক অভিযানকালে সামুদের বস্তি অতিক্রম

ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত তাবুকের যুদ্ধ। এটাই ছিল রাসূল (সাঃ)-এর জীবনের সর্ব শেষ জিহাদ। রাসূল আকরাম (সাঃ) সংবাদ পেলেন যে, রোমের বাদশাহ হেরাক্লিয়াস বিরাট সৈন্যদল নিয়ে সিরিয়ার পথে আক্রমণের উদ্দেশ্যে মদীনার দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। এ সংবাদ পেয়ে নবম হিজরী ৫ই রযব রাসূল (সাঃ) প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিশালী শত্রুর সাথে মোকাবিলা করার জন্য মদীনা হতে রওয়ানা হলেন। পুর্বাহ্নেই সে জন্যে রাসূল (সাঃ) সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিয়েছিলেন। "রোমের বাদশাহর সাথে যুদ্ধ করতে হলে তোমরা উত্তমরূপে প্রস্তুতি নাও।" তিনি নিজেও যুদ্ধের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। এ জিহাদেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাঁর সমুদয় সম্পদ আল্লাহ্র নামে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁকে যখন রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "ঘরে কি রেখে এসেছ? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে রেখে এসেছি।

হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর সম্পদের অর্ধাংশ এ জিহাদের জন্য দান করেন এবং হযরত ওসমান (রাঃ) এক তৃতীয়াংশ সৈন্যের যাবতীয় ব্যয় ভার বহন করেন। এরূপে প্রত্যেক সাহাবী (রাঃ)-ই এ যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য দান করে শরীক হয়েছিলেন। সে সময় মুসলমানগণ নিদারুন দারিদ্রতার মধ্যে জীবন-যাপন করছিলেন। সময়টা ছিল ভীষণ দুর্ভিক্ষের। তাই দশ দশ ব্যক্তি